Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন গোয়েন্দা

সৈকতে সাবধান

রকিব হাসান

ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করল জিনা।
'কি হলো ওর?' অবাক হয়ে ভাবল মুসা। 'দিন দিন এমন রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন?'
জিনার গলার একপাশে দুটো দাঁতের দাগ
সন্দেহ জাগাল ওর মনে।
ভ্যাম্পায়ার না তো?
'দূর! ভূত বলে কিছু নেই!' নিজেকে ধমক লাগাল সে।
কিন্তু জিনার অবস্থা শঙ্কিত করে তুলল ওকে।
ভূত যদি না হবে, রক্ত খেয়ে খেয়ে
জিনাকে রক্তশূন্য করে দিয়ে যাচ্ছে কিসে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

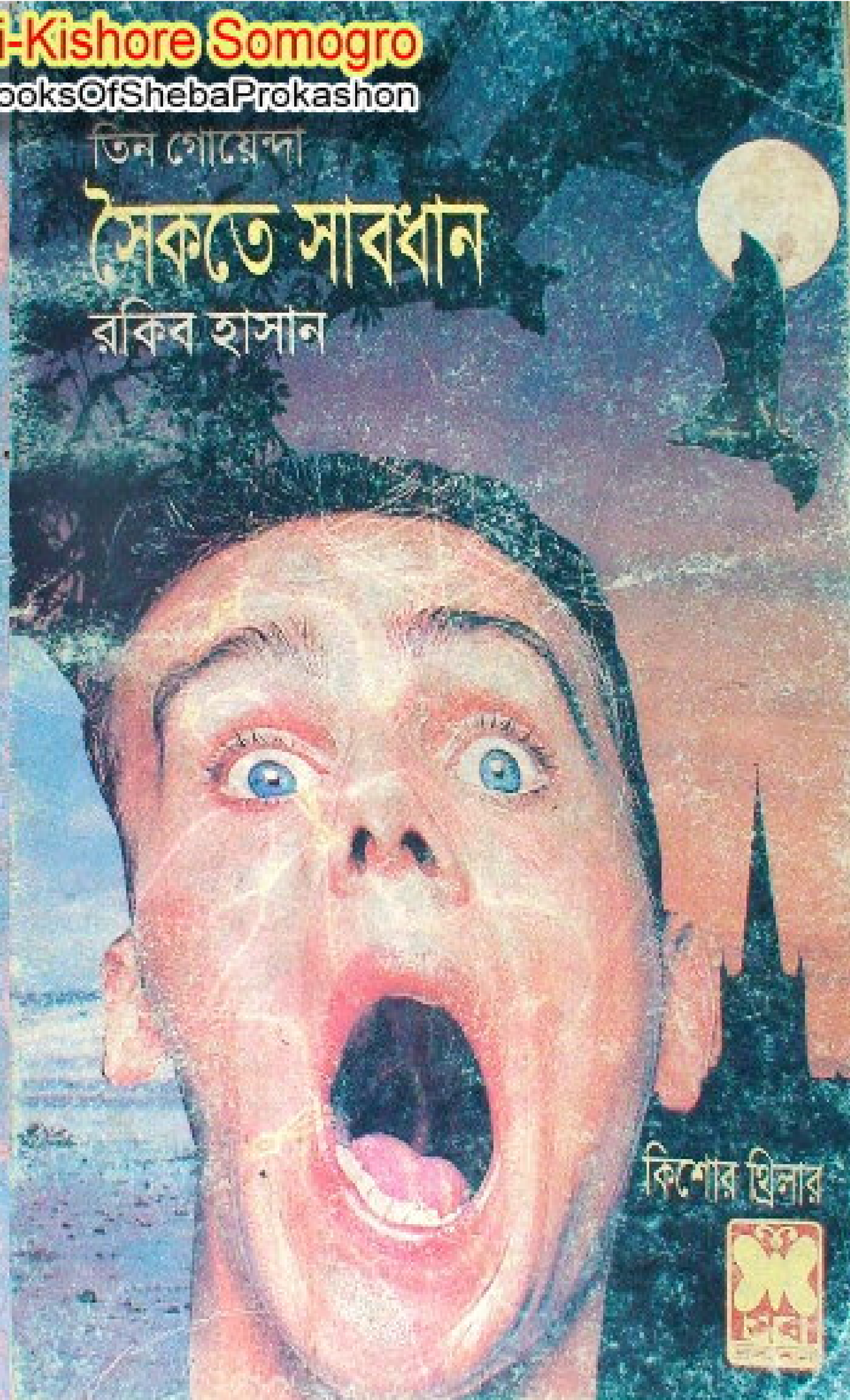

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

সৈকতে সাবধান

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৯৮

বিকেলটা মায়ের সঙ্গে কাজ করে কাটাল জিনা। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো, ব্যাগ-সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছানো, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঘরগুলো সাফসুতরো করা, খাবার আর প্রয়োজনীয় জরুরী জিনিস কিনে আনা, অনেক কাজ।

জিনার বাবা মিস্টার পারকার কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। করতে এসেছিলেন, কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজ বেশি-উল্টোপাল্টা করে কাজ আরও বাড়াতে লাগলেন, শেষে তাঁকে বিদেয় করে দিয়ে রেহাই পেয়েছেন মিসেস পারকার।

বারান্দায় বসে একটা বিজ্ঞানের বইতে ডুবে আছেন এখন মিস্টার পারকার।

বালিয়াড়ির আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। প্রবল বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে বাড়ির পেছনের শরবন। মিসেস পারকার রান্নাঘরে। হট ডগ আর মাংস ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

ডিনারের পর ওপরে চলে এল জিনা। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলানোর জন্যে আলমারি খুলল। অ্যানটিক ড্রেসিং টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল। দেরি হয়ে গেছে। মুসারা বসে থাকবে। দেখা করার কথা সাড়ে সাতটায়।

দুই টান দিয়ে পাজামা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল সে। আলমারি ঘেঁটে বের করল একটা ডেনিম কাটঅফ।

'সৈকতে যাবে নাহ' নিচ থেকে শোনা গেল মায়ের কণ্ঠ।

'নাহ। তুমি যাও,' জবাব দিলেন মিস্টার পারকার। 'আমি এই চ্যাপ্টারটা...'

'একা যেতে ইচ্ছে করছে না। থাক, সকালের নাস্তার জোগাড়টা করে ফেলিগে।'

'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেও পারো। অনেক পরিশ্রম করেছ।'

'আগে কাজকর্মগুলো সেরে ফেলি, তারপর...'

আয়নার সামনে এসে বসল জিনা। তামাটে চুল অনেক লম্বা হয়েছে। তারপরেও কাটতে ইচ্ছে করল না। ভাবতেই হেসে উঠল তামাটে গোখরোর বড় বড় দুটো মণি। মনে পড়ল, কয়েক বছর আগের গোকেল বীচের কথা। তখন চুল কেটে ছেলেদের মত করে রাখতে পছন্দ করত সে। এখন রাখে লম্বা চুল। মাত্র কয়েক বছরেই কত পরিবর্তন এসে যায় একজন মানুষের। বিশেষ

করে মেয়েদের। আগে হলে রাফিয়ানকে অবশ্যই সঙ্গে আনত। কোথাও বেড়াতে গেলে ওকে ফেলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না। আর এখন দিব্যি ফেলে এসেছে বাড়িতে, রকি বীচের বাড়িতে। আনাটাই বরং ঝামেলার মনে হয়েছে ওর কাছে।

সৈকত শহর স্যান্ডি হোলোতে বেড়াতে এসেছে ওরা। গরমকালটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছে মিসেস পারকারের। মিস্টার পারকারের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। যেখানেই যান, বই আর গবেষণায় ডুবে থাকতে পারলেই তিনি খুশি।

নিচে নেমে হাত নেড়ে মাকে 'গুড-বাই' জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জিনা। বাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে এসে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বীচ হ্যাভেন ড্রাইভ ধরে শহরের দিকে।

বীচ হ্যাভেন ড্রাইভ!

আহা, কি নাম! কানা ছেলে তার নাম পদ্মলোচন। সরু, এবড়োখেবড়ো একটা পথ, খোয়াও বিছানো হয়নি ঠিকমত।

গুচ্ছ গুচ্ছ সামার কটেজগুলোর কাছ থেকে মিনিট দশেক হেঁটে এলে পড়বে এক চিলতে বালিতে ঢাকা জমি। চারপাশ ঘিরে জন্মেছে শরবন। তারপর বিশাল ছড়ানো প্রান্তর, ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে তাতে মাথা তুলে রেখেছে একআধটা ওক কিংবা উইলো গাছ। ওগুলো সব পার হয়ে গেলে দেখা মিলবে ছোট্ট শহরটার।

রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোতেই শরবনের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। বাঘ আর কুকুরের মিশ্র ডাকের মত চিৎকার করে উঠল 'খাউম' করে। হাত চেপে ধরল জিনার।

ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল জিনা। অস্ফুট একটা শব্দ করল। মুখোমুখি হলো মূর্তিটার।

'কেমন ভয়টা দেখালাম,' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মুসার মুখে। ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'ভয় না, কচু! কিচ্ছু ভয় পাইনি আমি।'

'তাহলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?'

'কোথায় চেঁচালাম?'

'কোথায় চেঁচালে? দাঁড়াও, সাক্ষি জোগাড় করছি।' শরবনের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল মুসা, 'রিকি। বেরোও।'

শরবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মুসার বয়সী অনেক খাটো, রোগা একটা ছেলে। গাজর রঙের কোঁকড়া চুল। নীল চোখ। লাজুক ভঙ্গি। খুব শান্ত।

ওর দিকে হাত বাড়াল মুসা, 'দাও পাঁচ ডলার। বলেছিলাম না ভয় দেখাতে পারব।'

জিনার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল রিকি। কড়া দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। 'তা তো বলেছিলে···'

'আমি ভয়ে চিৎকার করেছি!' কোমরে হাত দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল জিনা। 'আমি!'

'অ্যাঁ!···না না না!' ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। মুসার চোখে চোখ পড়তেই আবার বলল, 'করেছে, কিন্তু···'

'নাহ্, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল জিনা। 'পুরুষ মানুষ, এত ভয় পাও কেন?'

জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল রিকি।

মাস দুই হলো জিনাদের বাড়ির পাশে ওদেরই অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে রিকিরা। ভীষণ লাজুক ছেলে। দুই মাসে জিনা আর তিন গোয়েন্দা ছাড়া আর কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেনি। পড়শী বলে ওরাই যেচে পড়ে খাতিরটা করেছে, নইলে তা-ও হত না।

'আজই এলে?' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল মুসা।

'আজ বিকেলে,' জবাব দিল জিনা। 'বাড়িটা ভালই, কিন্তু পরিষ্কার করতে জান শেষ। একটা হপ্তা লাগবে।'

'আমাদেরটাও একই। কাল এসে তো ঢুকেই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হলো মা'র। একটা জানালার কাঁচ ভেঙে কি জানি কি একটা জানোয়ার ঘরে ঢুকেছিল। আমাদের কার্পেটটাকে বাথরুম মনে করেছিল।'

'ওয়াক! থুহ্! আন্টির নিশ্চয় দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল?'

'না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। "আর কোনদিন আসব না" বলে রকি বীচে ফিরে যেতে চেয়েছিল তক্ষুণি,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'আমি আর বাবা অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছি।'

'এটা রকি বীচের চেয়ে খারাপ জায়গা,' পেছন থেকে বলল রিকি। জিনা আর মুসার কয়েক কদম পেছনে থেকে হাঁটছে।

'আমার তো খুব ভাল লাগছে,' মুসা জবাব দিল। 'দারুণ। সারাটা বিকেল সাগরে সাঁতরে কাটালাম, রোদের মধ্যে পড়ে থাকলাম। রাতে সৈকতে পার্টি হবে। সকালে উঠে নতুন করে আবার সব শুরু। কত মজা।'

'নতুন করে কি হবে?'

'গাধা নাকি। বুঝলে না। আবার বেড়ানো, সাঁতার কাটা, রোদে পোড়া, রাতে পার্টি···'

'একঘেয়ে লাগবে না?'

'মোটেও না। থাকো না দু'তিন দিন, বুঝবে আনন্দ কাকে বলে।'

আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তাটা ঘাসের মাঠ পেরিয়ে, একগুচ্ছ সাদা রঙ করা কাঠের বাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে গেছে শহরের দিকে।

শহরের মেইন রোডের কাঠে তৈরি ফুটপাথে যখন উঠল ওরা, বাতাস তখন বেশ গরম। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওরা।

'আরে,' মুসা বলল, 'প্রিন্সেসের পাশে আবার ভিডিও-গেম আর্কেডও খুলেছে দেখি এবার। রিকি, টাকাপয়সা কিছু এনেছ?'

জিনসের পকেট হাতড়ে নীল রঙের প্লাস্টিকের বুটেন লাইটারটা শুধু বের করে আনল রিকি। সব সময় জিনিসটা তার পকেটে থাকে। মাথা নাড়ল।

'এই গরমের মধ্যে ওই বদ্ধ জায়গায় ঢোকার ইচ্ছে হলো কেন তোমার?' জিনা বলল। 'বেড়াতে এসেছি, বেড়াব। ঘরে আটকে থাকার কোন মানে হয় না, সেটা যে ধরনের ঘরই হোক। চলো, খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সৈকতে চলে যাই।'

'চলো, কি আর করা,' আর্কেডের দিকে শেষবারের মত লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পা বাড়াল মুসা।

দুই

মেইন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে ওরা। জিনা ভাবছে, কিশোর আর রবিন থাকলে ভাল হত। ওরা আসেনি। ইয়ার্ডে প্রচুর কাজ। এই গ্রীষ্মে মেরিচাচী আর রাশেদ পাশা কোথাও বেড়াতে যাবেন না। কিশোরকেও আটকে দিয়েছেন চাচী। আর রবিন আবার পা ভেঙেছে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে। এখন শয্যাশায়ী। পাহাড়ে চড়া ওর কাছে নেশার মত। বহুবার পা ভেঙেছে। এমনও হয়েছে, জোড়া লাগতে না লাগতে আবার ভেঙেছে কয়েক মাসের মধ্যেই। তা-ও পাহাড়ে ওঠা বন্ধ করতে পারে না।

কিশোর অবশ্য বলে দিয়েছে, ইয়ার্ডের কাজ সেরে ফাঁক পেলেই চলে আসবে। তবে সেই ফাঁকটাই পাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে জিনার। সবাই একসঙ্গে না থাকলে জমে না। কিন্তু আসতে না পারলে কি আর করা। মেনে নিতেই হয়।

মেইন রোডের একধারে সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। উইন্ডোতে সাজানো জিনিসপত্র দেখতে দেখতে। টুরিস্ট সীজন সবে শুরু হয়েছে। এখনই প্রচুর ভিড়। মেইন স্ট্রীটে যানজট। ফুটপাথে মানুষের জট। একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা দল বেঁধে হাঁটছে। যার যেভাবে খুশি, যেদিকে ইচ্ছে। কারোরই কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই।

'খাইছে!' আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। রাস্তার অন্য পাড়ে পুরানো আমলে তৈরি সিনেমা হলটার দিকে চোখ। 'কি সব পোস্টার লাগিয়েছে দেখো! ভূতপ্রেতরা উৎসব করছে নাকি?' রিকির কাঁধে হাত রাখল সে। 'চলো তো, কাছে গিয়ে দেখি।'

জিনা আর রিকিকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে রাস্তা পেরোল সে। 'আসিতেছে' কিংবা 'আগামী অপেক্ষায়' লেখা পোস্টারগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'সব তো দেখা যাচ্ছে ভূতের ছবি।'

একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ভূতপ্রেতকে ভয় পায় মুসা, অথচ ওসব ছবির প্রতিই

তার আকর্ষণ বেশি।

গুঙিয়ে উঠল জিনা। মুসার যতটা পছন্দ, এধরনের ছবি তার ততটাই অপছন্দ। মুসার হাত ধরে টানল সে, 'এসো তো। পচা জিনিস দেখতে ভাল্লাগছে না।...ওদিকে কি হচ্ছে দেখি।'

রাস্তার শেষ বাড়ি এই সিনেমা হলটা। শহরটাও যেন শেষ হয়ে গেছে এখানে। কংক্রীটে তৈরি ছোট আয়তাকার একটা জায়গাকে পার্কিং লট করা হয়েছে। তার ওপারে ঘাসে ঢাকা মাঠ। শহরের অধিবাসীদের পিকনিক স্পট, জনসমাবেশ আর অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও ব্যবহার হয়। আজ রাতে অনেকগুলো উজ্জ্বল স্পটলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আলোর সীমানার বাইরে আবছা অন্ধকারে কয়েকটা ট্রাক আর ভ্যানগাড়ির কালো অবয়ব চোখে পড়ে।

এগিয়ে গেল তিনজনে। কার্নিভালের প্রস্তুতি চলছে। শ্রমিকদের হাঁকডাক, করাতের খড়খড় আর হাতুড়ির ঠুকুর-ঠাকুর শোনা যাচ্ছে অনবরত।

কেমন যেন! বাস্তব লাগছে না পরিবেশটা। স্পটলাইটগুলো আকাশের দিকে তুলে দেয়া হয়েছে। নিচে তাই আলোর চেয়ে ছায়াই ছড়াচ্ছে বেশি। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে শ্রমিকরা। কালো, নীরব একটা দৈত্যের মত অন্ধকারে মাথা তুলে রেখেছে একটা নাগরদোলা। খুঁটি থেকে ঝুলছে রঙিন আলো। খাবার আর খেলার স্টলগুলো খাড়া করে ফেলা হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। ছোট একটা রোলার-কোস্টার বসাতে গলদঘর্ম হচ্ছে কয়েকজন লোক।

মাঠের কিনারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মুসা, জিনা আর রিকি।

'গ্রেভিট্রন আছে নাকি ওদের কে জানে!' আচমকা যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলে উঠল রিকি।

'কি ট্রন?' বুঝতে পারল না মুসা।

'গ্রেভি। গ্রেভ থেকে গ্রেভি। গ্রেভ মানে জানো না? কবর।'

'ও। তো সেটা দিয়ে কি হয়? কবরে ঢোকায় নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই। বনবন করে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ মেঝেটা সরে যায়। সময়মত লাফ দিয়ে যদি দেয়ালের কাছে সরে যেতে পারো, বাঁচলে, নইলে পড়তে হবে নিচের অন্ধকার গর্তে।'

'বাহ্, দারুণ খেলা তো,' রোমাঞ্চকর মনে হলো জিনার।

অবাক হয়ে রিকির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'এই খেলা তোমার পছন্দ?'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল রিকি। 'ওটা কোন খেলা হলো নাকি? এত ভয় পেতে কে চায়? বিপদও কম না!'

'নাগরদোলাও আমার ভাল লাগে,' অন্ধকার মাঠের দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে আছে জিনা।

'ওসব পোলাপানের খেলা,' মুসা বলল। 'এর মধ্যে উত্তেজনার কি আছে?'

'সব কিছুতেই উত্তেজনা দরকার হয় নাকি? খেলা খেলাই। মজা পাওয়াটা

আসল কথা।'

জিনার হাত ধরে টানল মুসা, 'দেখা তো হলো। চলো, সৈকতে। এখানে বিরক্ত লাগছে আমার।'

পরিষ্কার রাতের আকাশ। উজ্জ্বল। মেঘমুক্ত। জ্যোৎস্নায় বালির সৈকতটাকে লাগছে চওড়া, রূপালী ফিতের মত।

পানির কিনার দিয়ে হাত ধরাধরি করে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। গোড়ালিতে মৃদু বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। পাউডারের মত মিহি বালিতে চাদর বিছিয়ে বসে হাসাহাসি করছে, গান গাইছে, চেঁচিয়ে কথা বলছে ছেলেমেয়েরা। কেউ বাজাচ্ছে টেপ। ড্রামের ভারী গুমগুম শব্দ তুলে বাজছে রক মিউজিক। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রেডিওর গান। ঢেকে দিচ্ছে সৈকতে ক্রমাগত আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল শব্দকে।

বালিয়াড়ির গোড়ায় আগুন জেলে বসেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। বালির ওপর দিয়ে ওদের দিকে খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে কয়েকজনকে চিনতে পারল মুসা আর জিনা। স্যান্ডি হোলোরই বাসিন্দা ওরা। আগের বার বেড়াতে এসে পরিচয় হয়েছে।

'হাই, টনি,' ডাক দিল মুসা।

ফিরে তাকাল টনি হাওয়াই। আগুনের আলো আর ছায়া নাচছে ছেলেটার চোখেমুখে। বেশ লম্বা। খাটো করে ছাঁটা কালো চুলের গোড়া ঝাড়ুর শলার মত খাড়া খাড়া। মুসাকে দেখে উজ্জ্বল হলো মুখ। 'আরি, মুসা? কেমন আছ? এখনও ভূতের ভয়ে কাবু?'

'তুমিও কি এখনও সেই বোকাই রয়ে গেছ?' বলেই এক থাপ্পড় কষাল ওর পিঠে মুসা।

গুঙিয়ে উঠল টনি। 'উফ্, বাপরে! গায়ের জোর কমেনি একটুও!'

হেসে উঠল দুজনেই।

পরিচিত সবগুলো ছেলেমেয়ে স্বাগত জানাল জিনা আর মুসাকে। সরে গিয়ে বসার জায়গা করে দিল। পরিচয় করিয়ে দিল অপরিচিতদের সঙ্গে। কড়কড়, ফুটফাট, নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে আগুন। আরামদায়ক উষ্ণতা।

রিকির কথা মনে পড়তে ডাক দিল মুসা, 'আই, রিকি, বসো।'

এত মানুষ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেছে রিকি। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে করে বসে পড়ল মুসার পাশে। দ্বিধা যাচ্ছে না কোনমতে। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, 'ও আমার বন্ধু, রিকি শর।'

'কিশোর আর রবিন এল না এবার?' জানতে চাইল টনি।

'না,' ঢোঁক গিলে নিয়ে বলল মুসা, 'রবিন আবার পা ভেঙেছে। কিশোর ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত। তবে বলেছে, সারতে পারলে, দু'চারদিনের জন্যে হলেও চলে আসবে।'

'কিশোর নেই,' বলল মুনা নামে একটা মেয়ে, 'তারমানে কোন রহস্য আর পাচ্ছ না তোমরা এবার।'

'পেলেই বা কি? নাকের সামনে পড়ে থাকলেও হয়তো দেখতে পাব না।'

'হুঁ, তা ঠিক। জিনা, কেমন আছ?'

'ভাল।'

'নতুন আর্কেডটা দেখেছ নাকি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল টনি। 'সাংঘাতিক!'

'দেখেছি। কিন্তু পয়সা আনিনি।'

'আমার কাছে আছে,' হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল টনি। 'চলো। খেলে আসি।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। জিনার দিকে তাকাল। একসঙ্গে বেড়াতে বেড়িয়ে ওকে ফেলে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মাথা নাড়ল, 'নাহ, আজ আর যাব না। এইমাত্র এলাম ওখান থেকে। দেখা যাক, কাল।'

'কাল তাহলে বেশি করে পয়সা নিয়ে এসো,' হাসল টনি। বসে পড়ল আবার। চুটিয়ে আড্ডা দিতে শুরু করল সবাই মিলে। রিকি বাদে। চুপ করে বসে আছে। চাদরের কিনারে জড়সড় হয়ে বসে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। কথা শুনছে। হাতের তালুতে আনমনে অনবরত ঘোরাচ্ছে নীল লাইটারটা।

ও যে অস্বস্তি বোধ করছে, বুঝতে পারল জিনা। বলল, 'রিকি, বসে থাকতে তোমার ভাল না লাগলে হেঁটে আসতে পারো ওদিক থেকে। আমরা আছি এখানে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রিকি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে।

তিন

গোল ছায়ায় বসে থাকা ছোট ছোট বিন্দুগুলোকে চিনতে সময় লাগল রিকির। সাগরের মাছখেকো পাখি। টার্ন। ছোট, মসৃণ একটা পাথরের টিলায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

চলতে শুরু করল বিন্দুগুলো। এগিয়ে চলল পানির দিকে। অন্ধকার গ্রাস করে নিল ওগুলোকে।

রিকির দুই হাত পকেটে ঢোকানো। পানির দিক থেকে ঘুরল। ফিরে তাকাল পাথরের পাহাড়ের দিকে। চূড়াটা একখানে সমতল একটা টেবিলের রূপ নিয়েছে। বাদুড় উড়ছে ওটার ওপরে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার সাগরের দিকে ঘুরল সে। প্রায় আধমাইল দূরে একটা দ্বীপের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে, বাতাস নিতে ভেসে ওঠা সাবমেরিনের পিঠের মত। বাদুড়গুলো বোধহয় ওই দ্বীপ থেকেই আসে, মনে হলো তার।

এত বাদুড় এখানকার সৈকতে! মুখ তুলে বেগুনী আকাশের দিকে তাকাল

সে। একটু আগেও মাথার ওপর উড়ছিল দুটো বাদুড়। এখন নেই।

সৈকতের এই অংশটুকু নৌকা রাখার ডকটা থেকে দক্ষিণে। এখানে দাঁড়ালে গাছপালায় ছাওয়া নির্জন দ্বীপটা ভালমত দেখা যায়, দিনের বেলায়ই দেখেছে। দূর থেকেই দ্বীপটা পছন্দ হয়ে গেছে তার। এর কারণ বোধহয় নির্জনতা। মানুষজন বিশেষ পছন্দ করে না সে। একা থাকতে ভাল লাগে। মসৃণ, শীতল পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপলক চোখে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ এভাবে ছিল বলতে পারবে না। হুঁশ হলো, যখন অস্পষ্ট হয়ে এল দ্বীপটা। তাকিয়ে দেখল, নিচে নেমে আসছে মেঘ। চাঁদ ঢেকে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগের রূপালী সৈকতটাকে লাগছে লম্বা, ধূসর একটা ছায়ার মত। বিচিত্র। অদ্ভুত। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে খেয়ে সাগরের দিক থেকে উড়ে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা। বাতাস ভেজা, ঠাণ্ডা, ভারী।

মুসারা কি চলে গেছে? না বোধহয়। ওকে ফেলে যাবে না।

সুন্দর জায়গা। চমৎকার পরিবেশ। সবাই কেমন আনন্দ করে কাটাচ্ছে। কিন্তু ও পারে না। নিজের ওপর রাগ হলো রিকির। কেন মিশতে পারে না মানুষের সঙ্গে? মেশার চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে। কিন্তু নিজের কথায় নিজেরই আস্থা নেই। বহুবার এরকম কথা দিয়েছে নিজেকে, চেষ্টাও করেনি তা নয়, কিন্তু পারেনি। এইবার পারতে হবে, পারতেই হবে—নিজেকে বুঝিয়ে পাথর থেকে নামতে যাবে, এই সময় ফড়ফড় শব্দ হলো মাথার ওপর।

মুখ তুলে দেখল, অনেকগুলো বাদুড় উড়ে এসেছে পাহাড়ের দিক থেকে। বিচিত্র ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটে রওনা হয়েছে যেন মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

বাদুড়েরা খুব ভাল প্রাণী, নিজেকে বোঝাল সে। ওরা পোকামাকড় খায়। খেয়ে মানুষের উপকার করে।

কিন্তু বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর তীক্ষ্ণ চিৎকার এখন ভাল লাগল না তার কাছে। মেরুদণ্ডে শিহরণ তুলল।

আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না। তাড়াহুড়ো করে নেমে এল নিচের কুয়াশা পড়া ভেজা বালিতে। নেমেই থমকে দাঁড়াল।

সে একা নয়। আরও কেউ আছে।

ওর পেছনে। পাথরের চাঙড়ের আড়ালে।

দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। কিন্তু মন বলছে, আছে।

মাথার ওপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ বাড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ে আসছে এখন পাহাড়ের দিক থেকে। অনেক নিচ দিয়ে উড়ছে। চলে যাচ্ছে সাগরের ওপরে নেমে আসা মেঘের দিকে। ওর গায়ে এসে লাগছে নোনা পানির কণা মেশানো ঝোড়ো বাতাস।

চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া দেখে ঝট করে পাশে ঘুরে গেল রিকি। দেখতে পেল মেয়েটাকে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কয়েক ফুট দূরে একটা পাথরের ওপর দাঁড়ানো। খালি পা।

ওকে তাকাতে দেখে নড়ে উঠল মেয়েটা। নিঃশব্দে পাথর থেকে নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

সুন্দরী। খুব সুন্দরী মেয়েটা। মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোতেও ওর রূপ যেন ঝলমল করছে। রিকিরই বয়েসী হবে। কিংবা দু'এক বছরের বড়।

'হাই,' মোলায়েম, মধুঝরা মিষ্টি কণ্ঠে ডাক দিল মেয়েটা। ডাগর কালো চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। বড় বড় ফুল ছাপা কাপড়ে তৈরি সারং স্কার্ট পরনে, তার সঙ্গে ম্যাচ করা বিকিনি টপ। ঝাঁকি দিয়ে কাঁধে সরিয়ে দিল মুখে এসে পড়া লম্বা লাল চুল। হাসল রিকির দিকে তাকিয়ে।

'হাই!' বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে রিকির। সবার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করবে—খানিক আগে নিজেকে দেয়া এই কথাটা বেমালুম ভুলে গেল। মানুষ! অপরিচিত! তার ওপর মেয়েমানুষ! ইস্, বালি ফাঁক হয়ে যদি গর্ত হয়ে যেত এখন, তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে রেহাই পেত সে।

'আমি পথ হারিয়েছি,' কাছে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। পারফিউমের গন্ধ লাগল রিকির নাকে। লাইলাক ফুলের মিষ্টি সুবাস।

'আঁ! কি হারিয়েছেন?'

'পথ। আপনি আপনি করছ কেন? আমি তোমার বয়েসীই হব।'

'প-প-প্পথ হারিয়েছেন···মানে, হা-হা-হারিয়েছ···' ঢোক গিলল রিকি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, বেড়াতে এসেছি আমরা। বাবা কটেজ ভাড়া নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলাম ওইই পাহাড়ের দিকে,' হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। হাতির দাঁতের মত ফ্যাকাসে সাদা গামড়া। 'এখন আর বুঝতে পারছি না কোনদিকে গেলে বাসাটা পাওয়া যাবে।'

'আমি···মানে···' কথা বলার জন্যে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রিকি। মনে মনে ধমক লাগাল নিজেকে—এই ব্যাটা, স্বাভাবিক হ! কথা বল ঠিকমত! এবং ধমকের চোটেই যেন হড়হড় করে শব্দগুলো বেরিয়ে এল মুখ থেকে, 'বেশির ভাগ সামার হাউসই ওই ওদিকটাতে।'

'ওদিকে?' ফিরে তাকাল মেয়েটা। দ্বিধা করছে।

'যাবে আমার সঙ্গে? ওদিকেই যাব।'

'থ্যাংকস,' বলে রিকিকে অবাক করে দিয়ে আন্তরিকতা দেখানোর জন্যে ওর একটা হাত ধরে টান দিল মেয়েটা। 'চলো।'

এক ঝলক কড়া মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে ঢুকল। বোঁ করে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল রিকির। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। জোর করে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল, কোনটাই পেল না। অদ্ভুত অনুভূতি। তাকে বাদ দিয়েই যেন পা দুটো চলতে শুরু করল মেয়েটার সঙ্গে।

'এদিকে এই প্রথম এলাম। সুন্দর জায়গা। ছুটিটা এবার খুব ভাল কাটবে,' মেয়েটা বলল।

'অ্যা!···হ্যাঁ। খুব ভাল।'

ফিরে তাকাল মেয়েটা। 'আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছ কেন এমন? কথা জড়িয়ে যাচ্ছে

কেন? শরীর খারাপ নাকি তোমার?'

মেয়েটার কুঁচকানো ভুরু আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকানোর সাহস হলো না রিকির। আরেকদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'কই, না তো! অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'হ্যাঁ, তা লাগতে পারে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে খুব। কুয়াশাও কি রকম করে ছুটে আসছে। অবাক কাণ্ডই। সন্ধ্যায় যখন বেরিয়েছি, রীতিমত গরম ছিল।'

'ওই পাহাড়ে গিয়েছিলে কি করতে? একা একা তোমার ভয় করে না?'

'না। তোমার করে?'

'না। একা থাকতেই আমার বরং ভাল লাগে।'

'আমারও।'

এই একটা কথাতেই আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেল রিকির। হয়তো নিজের সঙ্গে মেয়েটার মিল খুঁজে পেয়েই। ভেবে নিল, মেয়েটাও লাজুক, সে-ও লাজুক। যদিও আড়ষ্টতার ছিটেফোঁটাও নেই মেয়েটার মধ্যে।

রিকির কব্জিতে চেপে বসল মেয়েটার আঙুল। মৃদু হাসল। 'তাহলে তো আমরা বন্ধু হতে পারি।'

'তা পারি,' মনে মনে বলল রিকি। মুখ দিয়ে বের করতে পারল না।

'কোন শহর থেকে এসেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'রকি বীচ।'

পাশাপাশি হাঁটছে দুজনে। বালিয়াড়ির পাশ থেকে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। কথা বলতে বলতে পানির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওকে মেয়েটা। তবে টানটা দিচ্ছে বড়ই আস্তে, হাঁটছে ধীরে ধীরে।

পানির কিনারে কুণ্ডলী পাকানো কুয়াশা।

লাইলাক ফুলের গন্ধ থেকে থেকেই নাকে ঢুকছে রিকির।

'ওই দেখো, কেমন সুন্দর কুয়াশা,' ঘন একটা কুণ্ডলীর দিকে হাত তুলে বলল মেয়েটা। 'ঢুকে দেখবে নাকি কুয়াশার মধ্যে কেমন লাগে?'

রিকির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করছে: যেয়ো না, যেয়ো না! কিন্তু বাধা দিয়ে নিজেকে রুখতে পারল না রিকি। এড়াতে পারল না মেয়েটার হাতের টান। আস্তে আস্তে ঢুকে গেল ঘন কুয়াশার মধ্যে। এতই ঘন, দুই হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। এরই মধ্যে একটা ঝিলিমিলি ছায়ার মত মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে সে।

নাকের কাছে দুলে উঠল কি যেন। বুঝতে পারল না রিকি। লাইলাকের মিষ্টি গন্ধটা তীব্রতর হলো। তার সঙ্গে মিশে গেছে আরেকটা কি রকম গন্ধ।

বোঁ করে আবার চক্কর দিল মাথাটা। এবার আর গেল না অদ্ভুত অনুভূতিটা। এরই মধ্যে টের পেল গলায় নরম ঠোঁটের ছোঁয়া। পরক্ষণে কুট করে চামড়ায় তীক্ষ্ণ সুচ বেঁধার মত যন্ত্রণা।

একটা মুহূর্ত মাথার ভেতরে-বাইরে সমানে পাক খেতে থাকল যেন ভেজা

কুয়াশা। তারপর অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

চার

কোথায় ও?

আর্কেডের ভেতরের সরু গলি ধরে এগিয়ে চলল জিনা। গিজগিজে ভিড়। বোমা বিস্ফোরণ, স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, মহাকাশ যুদ্ধ আর রেসিং কার ছুটে চলার শব্দে ছোট্ট, স্বল্পালোকিত ঘরটায় কান পাতা দায়।

এখানে নেই।

কোথায়?

আর্কেডের পেছনে পিনবল মেশিন নিয়ে যেখানে খেলা চলছে সেখানেও নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এল জিনা। খোলা বাতাসে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অত বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন্ মজা যে পায় ওই ছেলেগুলো! ভিডিও গেম খেলার নেশাটা আগে ছিল না মুসার, ইদানীং ধরেছে। কিশোর আর রবিনের কথা ভেবে আরেকবার আফসোস করল জিনা। ওরা থাকলে এই একাকিত্বে ভুগতে হত না। মুসাও নিশ্চয় খেলা নিয়ে মেতে উঠত না এতটা।

মুসাকে দোষ দিল না সে। মেয়েমানুষের সঙ্গে সারাক্ষণ যদি থাকতে না চায়, কিছু বলার নেই। আর তার নিজের মুশকিল হলো, সে নিজে মেয়ে হয়েও মেয়েদের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না।

দূর! কাজ নেই, কর্ম নেই, কথা বলার মানুষ নেই: এই বেড়ানোর কোন মানে হয় নাকি? রকি বীচে ফিরে যাবে কিনা ভাবতে শুরু করল সে।

সাগর থেকে ভেসে আসছে কুয়াশার কুণ্ডলী। অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পথের ওপর। রাস্তার আলোর আশেপাশে বিচিত্র ছায়া তৈরি করছে। মেইন রোডের পাশের দোকান আর রেস্তোরাঁগুলোর দিকে তাকাল জিনা। প্রচুর ভিড়। কুয়াশার মধ্যে মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে বল বেঁধে উড়ছে।

ঘন হচ্ছে কুয়াশা। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঢেকে ফেলবে সব কিছু। 'প্রিন্সেস' শপিং মলের পাশে আইসক্রীম পারলারটার দিকে এগোল সে।

পেল না এখানেও। আশ্চর্য! মুসারও দেখা নেই, রিকিরও কোন খবর নেই। গেল কোথায় ওরা? আশেপাশেই তো থাকার কথা। এ সময় বাসায় ঘরে বসে আছে, এটাও বিশ্বাস করতে পারল না। ভুল করেছে। মুসাদের কটেজটা ঘুরে এসে পারত।

'হাই, জিনা!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা।

না, মুসা নয়। আগের রাতে সৈকতে আগুনের ধারে পরিচয় হওয়া একটা ছেলে। সঙ্গে আরেকজন। দুজনেই ওর দিকে হাত নেড়ে চলে গেল সামনের

দিকে। হারিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়।

বাড়ি থেকে বেরোতে বোধহয় দেরি করে ফেলেছে মুসা। চলে আসবে এখুনি, ভেবে, একটা স্ট্রীটল্যাম্পের নিচে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। হঠাৎ বিচিত্র এক অনুভূতি হলো–কেউ নজর রাখছে ওর ওপর।

ফিরে তাকাতে দেখল, ঠিক। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। ওর চেয়ে বছর দু'তিনের বড় হবে। তরুণই বলা চলে। হালকা-পাতলা শরীর, তবে রোগা বলা যাবে না। গায়ে কালো সোয়েটশার্ট, পরনে গাঢ় রঙের মোটা সূতী কাপড়ের প্যান্ট। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল। কাছে এসে দাঁড়াল। অপূর্ব সুন্দর কৌতূহলী দুটো কালো চোখের দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল জিনাকে। সিনেমার নায়ক কিংবা দামী মডেল হবার উপযুক্ত চেহারা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কারও জন্যে অপেক্ষা করছ বুঝি?'

এক পা পিছিয়ে গেল জিনা।

'ও। সরি। বিরক্ত করলাম,' তাড়াতাড়ি বলল ছেলেটা। এ শহরের বাসিন্দা নয় ও, চামড়াই বলে দিচ্ছে। ফ্যাকাসে সাদা। এখানকার মানুষের চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে সব তামাটে হয়ে গেছে।

'না না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল জিনা। এই কুয়াশার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। আটকাতে চাইল ছেলেটাকে, 'আপনি এখানে এই প্রথম এলেন?'

'তুমি করেই বলো। আপনি শুনতে ভাল্লাগে না।' মাথা নাড়ল, 'না, আরও বহুবার এসেছি।...দেখো, কি কুয়াশা! এ রকম আর কখনও দেখিনি এখানে।'

'আমিও না,' হাত বাড়িয়ে দিল জিনা, 'আমি জর্জিনা পারকার। জিনা বললেই চলবে।'

'জন গুডওয়াকার,' জিনার হাত চেপে ধরে ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়েই ছেড়ে দিল ছেলেটা।

এতই ঠাণ্ডা, জিনার মনে হলো বরফের ছোঁয়া লেগেছে ওর হাতে। 'অনেক পুরানো নাম। তোমার পোশাকও খুব পুরানো আমলের।'

মাথা ঝাঁকাল জন, 'হ্যাঁ। পুরানো আমলই আমার পছন্দ। এখনকার কোন কিছু ভাল লাগে না।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল দুজনে।

ঘড়ি দেখল জিনা। পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার বন্ধু আসবে তো?' জিজ্ঞেস করল জন। 'এখানেই দেখা করার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা, 'হ্যাঁ, আর্কেডের সামনেই থাকতে বলেছে। শহরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সৈকতে যাওয়ার কথা আমাদের। কি হলো ওর বুঝতে পারছি না!'

'দেখোগে, দেরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে তোমাকে পাবে না ভেবে সরাসরি সৈকতেই চলে গেছে।'

তাই তো! একথাটা তো ভাবেনি এতক্ষণ।

'আজ রাতে বেশি ভিড় থাকবে না সৈকতে,' আবার বলল জন। 'অনেকেই কুয়াশা পছন্দ করে না। ওকে খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না।'

'তা ঠিক,' জিনার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'কিন্তু যা অন্ধকার...'

'চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমার কোন কাজ নেই। ঘুরতেই বেরিয়েছিলাম...'

'কিন্তু...'

'আরে, চলো। এই এলাকা আমার মুখস্থ। দশ মিনিটও লাগবে না ওকে খুঁজে বের করতে।'

কোন রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে জিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল জন।

পথের মোড় ঘুরে ডিউন লেনে পড়ল ওরা। সোজা এগোল সাগরের দিকে। অবাক লাগল জিনার, যতই সৈকতের কাছাকাছি হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে কুয়াশা।

জিনার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন জবাব দিল জন, 'স্যান্ডি হোলো শহরটা অনেক নিচুতে, অনেকটা গিরিখাতের মত জায়গায়। এতে হয় কি, সাগর থেকে কুয়াশা এসে একবার চড়াও হলে বদ্ধ জায়গায় আটকে যায়, আর সরতে চায় না।'

'তুমি কি ভূগোলের ছাত্র?'

'নাহ্। ব্যাপারটা জানি আর কি।'

সৈকতের কিনার থেকে সাগরের বেশ খানিকটা ভেতর পর্যন্ত আকাশে ভারী, ধূসর মেঘ। কিন্তু কুয়াশা প্রায় নেই। বড় বড় ঢেউ আছড়ে ভাঙছে তীরে। অন্ধকারেও ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনা চোখে পড়ছে।

পানির কিনারে হাঁটছে কয়েক জোড়া দম্পতি। খানিক দূরে পানির বেশ কিছুটা ওপরে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসে আড্ডা দিচ্ছে কতগুলো ছেলেমেয়ে। উঁচুস্বরে টেপ আর রেডিও বাজছে।

কাছে গিয়ে দেখল জিনা। মুসাও নেই, কিকিও না।

তাতে হতাশ হলো না দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল জিনা। তারমানে জনের সঙ্গ তার খারাপ লাগছে না। পানির কিনার ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে জন। অনেক কিছু জানে। একটা তিমির গল্প বলল। পথ হারিয়ে বসন্তের শুরুতে নাকি তীরের একটা অল্প পানির খাঁড়িতে এসে আটকে গিয়েছিল। ওটার বন্দি চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে ছবিটা দেখিয়ে দিল জিনাকে। শহরের লোকে বহু কষ্টে খোলা সাগরে বের করে দিয়েছিল আবার তিমিটাকে।

কথা বলতে বলতে কখন যে ওরা দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেছে, বলতে পারবে না। হঠাৎ লক্ষ করল জিনা, পানির ধার থেকে তীরের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। সামনেই পাথরের পাহাড়।

একপাশে বেশ খানিকটা দূরে বোট ডক। ঢেউয়ের গর্জন বেড়েছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিনা। এত নির্জনতা তার পছন্দ হচ্ছে না।

'কই, সমস্ত সৈকতই তো চষে ফেললাম,' যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই সহজ কণ্ঠে বলল জন। 'তোমার বন্ধুকে তো পাওয়া গেল না। বেরোয়ইনি হয়তো বাড়ি থেকে।'

'চলো, ফিরে যাই,' পা বাড়াতে গেল জিনা।

'দাঁড়াও না, ভালই তো লাগছে। থাকি আরেকটু।'

'নাহ্, আমার ভাল লাগছে না।'

সামনে এসে দাঁড়াল জন। মুখোমুখি হলো। হাতটা চলে এল জিনার নাকের কাছে।

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ঢুকল জিনার। বডি স্প্রে'র নয়। আফটার শেভ লোশন? হবে হয়তো। কোন্ ব্র্যান্ডের লোশন ব্যবহার করে জন, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল জিনা, এই সময় চোখ চলে গেল ওপর দিকে। মেঘের নিচ দিয়ে উড়ে যেতে দেখল কয়েকটা বাদুড়কে।

'এখানে অতিরিক্ত বাদুড়!'

'বাদুড়কে ভয় পাও নাকি?'

মুখ নামাল জিনা। 'ভয় পাব কেন?'

'না, এমনি। বাদুড়ের সঙ্গে ভ্যাম্পায়ারের সম্পর্ক আছে কিনা। স্যান্ডি হোলোতে কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের গুজব আছে। মানুষকে আক্রমণ করার কথাও শোনা যায়।'

'দূর, ওসব ফালতু কিচ্ছা। আমি বিশ্বাস করি না।'

'যখন পড়বে ওদের কবলে, তখন বুঝবে মজা,' রহস্যময় কণ্ঠে বলে হাসতে লাগল জন। আবার হাত বাড়াল জিনার নাকের কাছে।

মিষ্টি গন্ধ পেল জিনা। কিসের গন্ধ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে এবারও জিজ্ঞেস করা হলো না। কথা শোনা গেল। বাঁকের আড়াল থেকে বেশ জোরেই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল একজোড়া দম্পতি। ওদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে তাকাল। জিনা আর জনের উদ্দেশে হাত নাড়ল মহিলা।

জিনাও হাত নেড়ে জবাব দিল। জনের হাত ধরে টানল, 'এসো। এখানে আর ভাল লাগছে না আমার।'

মনে হলো, দম্পতিরা আসাতে নিরাশ হয়েছে জন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চলো।'

পাঁচ

'সাগরের কি অবস্থা?' জানতে চাইলেন মিস্টার আমান। পরনে বেদিং স্যুট। রান্নাঘরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কাপে কফি ঢালছেন। চোখে এখনও ঘুম।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল মুসা। বাবা-মা তখনও ঘুমে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। সৈকতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেরে সবে

ফিরেছে।

'সাংঘাতিক,' বলে, টান দিয়ে ফ্রিজের ডালা খুলল মুসা। কমলার রসের প্যাকেট বের করল।

কফির কাপে চুমুক দিলেন মিস্টার আমান। 'সাংঘাতিক মানে?' খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ। 'ঝড়ের তো কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'ঝড়ের কথা বলিনি। বড় বড় ঢেউ। বিশাল একেকটা।' প্যাকেটের কোণা দাঁত দিয়ে কেটে ফুটো করে মুখে লাগাল মুসা। এক চুমুকে অর্ধেকটা খতম করে ফেলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে তাকাল। 'বাবা, কখন উঠেছ?'

দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। সাড়ে ন'টা বাজে। 'এই বিশ মিনিট। কেন?'

'রিকি ফোন করেছিল?'

'না,' হাই তুললেন মিস্টার আমান। 'টেনিস খেলতে যাবে নাকি?'

'না। সাঁতার। বডিসার্ফিং। যা ঢেউ একেকখান, খুব মজা হবে।' ওয়ালফোনের কাছে এসে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। নম্বর টিপতে যাবে, এই সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আমান, 'দেখো দেখো, একটা হামিংবার্ড!'

রিসিভার রেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল মুসা। 'কই? কোথায়?'

'ওই তো, ওই ফুলটার কাছে ছিল। মিস করলে।'

'কতবড়?'

'মৌমাছির সমান।'

'এখানে সবই মৌমাছির সমান নাকি? কাল রাতে আমার ঘরে কতগুলো নীল মাছি ঢুকেছিল। মৌমাছির সমান। এত্তবড় মাছি আর দেখিনি।'

'এত ছোট পাখিও আর দেখিনি,' ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন আমান। পাখিটাকে খুঁজছে তাঁর চোখ।

মুসাও তাকিয়ে আছে।

কফি শেষ করে কাপটা কাউন্টারে রেখে ফিরে তাকালেন আমান, 'রিকিকে ফোন করছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এত সকালে? এখানে এত তাড়াতাড়ি তো কেউ ওঠে না।'

'রিকি আমার চেয়েও সকালে ওঠে।'

আবার গিয়ে রিসিভার কানে ঠেকাল মুসা।

অনেকক্ষণ রিঙ হওয়ার পর ধরলেন রিকির আম্মা।

'আন্টি, আমি মুসা। রিকি কোথায়?'

'অ, তুমি। বাগান থেকে রিঙ হচ্ছে শুনলাম। এসে ধরতে দেরি হয়ে গেল।...রিকি তো এখনও ওঠেনি। কাল রাতে দেরি করে ফিরেছে। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

'আলসেমি রোগে ধরল নাকি ওকে!' আনমনে বলল মুসা। ঘড়ির দিকে তাকাল। সব সময় ভোরে ওঠা রিকির অভ্যেস। পৌনে দশটা পর্যন্ত কখনও বিছানায় থাকে না।

রিসিভার ধরেই আছে মুসা। অনেকক্ষণ পর পায়ের শব্দ শুনল। খুটখাট শব্দ। ভেসে এল রিকির ঘুমজড়ানো, খসখসে ভারী কণ্ঠ, 'হালো!'

'রিকি? ঘুম থেকে উঠে এলে নাকি?'

নীরবতা। 'হ্যাঁ।' হাই তোলার শব্দ।

'কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

গলা পরিষ্কার করে নিল রিকি, 'একটা মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'খাইছে! কি বললে?' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না মুসা।

'মেয়েটা অদ্ভুত, বুঝলে। ওর সঙ্গে হাঁটতে, কথা বলতে, একটুও সঙ্কোচ হচ্ছিল না আমার।'

'তোমাদের হলো কি! তুমি গেলে একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে, জিনা গেল একটা ছেলের সঙ্গে...হ্যাঁ, তারপর?'

ঘুমজড়িত কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল রিকি।

'আই রিকি, শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ কি জানি হয়েছে আমার। কিছুতেই চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছি না। ঘুম যাচ্ছেই না।'

'জাহান্নামে যাক তোমার ঘুম। মেয়েটা কে?'

'লীলা। খুব ভাল মেয়ে। না দেখলে বুঝবে না। আমার সঙ্গে এত ভাল আচরণ করল। আমাকে ব্যঙ্গ করল না, ইয়ার্কি মারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে কোন অসুবিধেই হয়নি আমার।'

'ভাল। তা-ও যে আড়ষ্টতাটা দূর হচ্ছে তোমার...সৈকতে যাবে না?'

'নাহ্। পারব না। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। দুর্বলও লাগছে খুব। রাতে কুয়াশার মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছি অনেক। জ্বরটর আসবে নাকি বুঝতে পারছি না। এলে বিপদে পড়ে যাব।'

'কিসের বিপদ?'

'লীলাকে কথা দিয়েছি, আজ রাতে ওকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরোব। তুমি আর জিনাও চলে এসো।'

'আসব। তোমার শরীর কি খুবই খারাপ? যা দারুণ ঢেউ দেখে এলাম না। সার্ফিঙে না গেলে মিস করবে।'

'পারছি না, ভাই। সত্যি খুব দুর্বল লাগছে। এত ঘুম আমার জীবনেও পায়নি। রিসিভার ধরে রাখতে পারছি না। রাখি, অ্যাঁ? রাতে দেখা হবে।'

মুসা জবাব দেয়ার আগেই লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে ভাবতে লাগল মুসা, কার সঙ্গে সার্ফিঙে যাওয়া যায়? টনির কথা মনে পড়ল।

ফোন করল। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করেও পেল না ওকে। ফোন ধরল না

কেউ টনিদের বাড়িতে।

তারপর করল জিনাকে। জিনার আম্মা ধরলেন। জানালেন, জিনা বাথরুমে। দিনের বেলা কোথাও বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। ঘরের কাজ আছে। এত বেশি জঞ্জাল, সাফ করতে করতেই বেলা গড়াবে।

হতাশ হয়ে শেষে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। বাবা বাগানে ফুলগাছগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। হামিংবার্ডটাকে আবার দেখার আশা ছাড়তে পারেননি এখনও। মনেপ্রাণে তিনি একজন নেচারালিস্ট। জন্তু-জানোয়ার ধরতে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কত জায়গায় যে গিয়েছেন। আমাজানের জঙ্গলেও গিয়েছিলেন একবার।

বাইরে বেরোল মুসা। আর কোন উপায় না দেখে বাবাকেই পাকড়াও করল। 'বাবা, সাঁতার কাটতে যাবে না? এক মিনিট দাঁড়াও। আমি স্যুটটা পরে আসি।'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন মিস্টার আমান। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে, 'কেন, কাউকে জোগাড় করতে পারলে না। সাগরে যখন ঢেউ বেশি, সাঁতার কাটতে না-ই বা গেলাম আজ। বরং এক কাজ করি চলো। হামিংবার্ড আর প্রজাপতির ছবি তুলেই কাটাই। একটা দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতিও দেখলাম ওদিকের ঝোপটায়। ধরতে পারলে মন্দ হয় না।'

ছয়

রাত আটটার সামান্য পরে জিনাকে নিয়ে পিজ্জা কোভে ঢুকল মুসা। একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল রিকি আর লীলাকে।

'রিকিকে অমন লাগছে কেন?' মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জিনা।

'কেমন?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'ঠিক বোঝাতে পারব না। মোটকথা, অন্য রকম।'

পিজ্জা হাউসটায় খুব ভিড়। প্রায় সবই ওদের বয়েসী ছেলেমেয়ে। গুঁতোগুঁতি করে টেবিলে জায়গা করে নিচ্ছে। হই-হল্লা করছে।

মুসাদের দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল রিকি। বোধহয় আগেই লীলাকে কিছু বলে রেখেছে, লীলাই ওদের সঙ্গে পরিচয় করে নিল, 'হাই, আমি লাইলাক। রিকির নতুন বন্ধু। অতএব তোমাদেরও। লীলা বলে ডাকবে।'

কিন্তু 'নতুন বন্ধু'টিকে পছন্দ করতে পারল না জিনা। লীলার বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মিলিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'হাই।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রিকি, 'পিজ্জার অর্ডার দিয়ে রেখেছি।'

'তোমরাও কি রকি বীচ থেকে?' লীলা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।

জিনা তাকিয়ে আছে লীলার নখের দিকে। লম্বা, নিখুঁত। সুন্দর করে নেল পালিশ লাগানো। লিপস্টিকের মত একই রঙের। রিকির দিকে কাত হয়ে বসেছে সে।

রিকির এই পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেছে জিনা। মেয়েটার বেহায়াপনা সহ্য করছে কি করে রিকি?

ধাতব ট্রে'তে করে গরম গরম পিজ্জা এল। ধোঁয়া উড়ছে। কেটে নিয়ে আসা হয়েছে। হাত বাড়িয়ে একটা করে টুকরো তুলে নিল মুসা, জিনা আর রিকি।

লীলা নিল না। তাকালই না প্লেটের দিকে। কৈফিয়ত দিল, 'পেট ভরে ডিনার খেয়ে এসেছি। একটা কণাও আর ঢোকানোর জায়গা নেই।'

'আরে একটু নাও না,' অনুরোধ করল রিকি।

'উঁহু, পারব না। খাও তোমরা।'

খাবার দেখে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেছে লীলা, লক্ষ করল মুসা। চোখে ক্ষুধার্ত মানুষের দৃষ্টি। তাহলে নিচ্ছে না কেন?

জিনাও তাকিয়ে আছে লীলার চোখের দিকে। দরজার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে যেতে দেখল ওর বাদামী চোখ।

ফিরে তাকাল জিনা। জনকে ঢুকতে দেখে তার চোখও স্থির হয়ে গেল ওর ওপর।

চোখে চোখ পড়তে হাসল জন।

মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল জিনা। 'ওর সঙ্গেই কাল রাতে দেখা হয়েছিল আমার।'

মুখ ভর্তি পিজ্জা চিবাতে চিবাতে ফিরে তাকাল মুসা। 'ও।' একনজর দেখল জনকে। তারপর আবার খাবারে মন দিল।

ওদের দিকে এগিয়ে এল জন।

পরিচয় করিয়ে দিল জিনা, 'ও জন গুডওয়াকার। কাল রাতে পরিচয়।...জন, ও আমার বন্ধু মুসা। ও রিকি। আর ও লীলা, রিকির নতুন বন্ধু।'

হাত মেলাল জন। একটা চেয়ারে বসল।

ট্রেটা ওর দিকে ঠেলে দিল মুসা, 'পিজ্জা নাও।'

'নো, থ্যাংকস,' চেয়ারে হেলান দিল জন। 'এইমাত্র খেয়ে এলাম।' তাকালই না খাবারের দিকে। জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'সৈকতের ধারে হাঁটতে যাবে না আজ?'

জনের দিকে তাকাল জিনা। আটকে রইল চোখ। কেমন সম্মোহনী দৃষ্টি জনের চোখে। জোর করে নজর সরাতে হলো জিনাকে। মুসার দিকে তাকাল, 'মুসা, কি করবে?'

'আমি?' সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন মুসা। 'তোমার কি ইচ্ছে?'

'হাঁটতে যেতেই ইচ্ছে করছে।'

'আমারও,' লীলা বলল। 'রিকির সঙ্গে।' রিকির বাহুতে হাত রাখল লীলা, 'রিকি, কি বলো?'

ঘাড় কাত করল রিকি, 'ভালই হয়।'

'ভিডিও গেম খেলতে যাবে না?'

'বদ্ধ জায়গায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে না আর আমার। হট্টগোল, মনিটরের স্ক্রীনের আলো...নাহ! তারচেয়ে সৈকতের খোলা হাওয়া, অন্ধকারে হেঁটে বেড়ানো অনেক ভাল।'

জিনার দিকে তাকাল মুসা।

মাথা নাড়ল জিনা, 'উঁহু, আমিও যাচ্ছি না ওই আর্কেডে। সিনেমাও ভাল লাগবে না। তারচেয়ে সাগরের খোলা হাওয়াই ভাল।'

হঠাৎই আবিষ্কার করল মুসা, এখানে বড় একা হয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক আছে, যাও তোমরা। দেখি, আমি বরং টনিকে খুঁজে বের করিগে। ভিডিও-গেম খেলব। ওকে না পেলে সিনেমা দেখতে যাব। একাই যাব।'

দ্রুত খাওয়া শেষ করল রিকি। বেরোনোর জন্যে যেন আর তর সইছে না। ওর অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারল না মুসা। তবে বদলে যে গেছে, এ ব্যাপারে জিনার সঙ্গে এখন সে-ও একমত।

প্রায় অপরিচিত একটা ছেলের সঙ্গে জিনার যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছে না তার। কিন্তু কি করবে? যার সঙ্গে খুশি বেরোতে পারে জিনা, তাকে বাধা দেয়ার কোন অধিকার তার নেই। বাধা দিলে জিনাই বা শুনবে কেন?

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল রিকি। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিল আমি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি শেষ করেই বেরোও।' জিনার দিকে ফিরল, 'তোমার হয়েছে?'

'হ্যাঁ, চলো।' পেপার ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল জিনা।

বেরিয়ে গেল চারজনে।

দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত ভঙ্গিতে পিজ্জা চিবাতে লাগল মুসা। কিশোর আর রবিনের অভাবটা তীব্রভাবে বোধ করল আরেকবার। দূর, একা একা কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে আনন্দ নেই। স্যান্ডি হোলোর মত এত চমৎকার জায়গাতেও না। একমাত্র ভরসা এখন টনি। ওকে খুঁজে বের করতে না পারলে সন্ধ্যাটাই মাটি হবে।

সাত

দুদিন পর। সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে, হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। উঠে এসে দাঁড়াল বেডরুমের জানালার সামনে। বাইরের উজ্জ্বল

আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল। পরিষ্কার আকাশ। গাছের মাথার ওপরে উঠে গেছে সূর্য। ঘরটা গরম, আঠা আঠা লাগছে।

আবার হাই তুলতে তুলতে ড্রেসারের দিকে এগোল সে। ড্রেসারের গায়ে ধাক্কা লাগল। ঘুম যায়নি এখনও। ড্রয়ার ঘেঁটে বের করল বেদিং স্যুট। টেনেটুনে পরে নিল কোনমতে।

দুপদাপ করে নেমে এল রান্নাঘরে। কাউন্টারে রাখা চাপা দেয়া এক টুকরো কাগজ দেখতে পেল। বাবা লিখে রেখে গেছেন। মাকে নিয়ে চলে গেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে। দূরে কোথাও মাছ ধরতে যাবেন সকলে মিলে। ইস্, আফসোস করতে লাগল মুসা। জানলে সে-ও যেতে পারত সঙ্গে। এখানে আর কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। রিকি যেন কেমন হয়ে গেছে। জিনার সঙ্গেও জমছে না।

গতরাতে কখন ফিরেছিল? মনে করতে পারল না মুসা। বাড়ি ঢুকে ঘড়ি দেখেনি। সিনেমা দেখে, টনি আর আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিল কার্নিভলে। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে তখন। মাঠ অন্ধকার।

মাঝরাতের পরই হবে, এটা ঠিক। কারণ নাইট শো দেখেছে। তার সঙ্গে জিনা আর রিকিকে না দেখে প্রশ্ন চেপে রাখতে পারেনি টনি। 'জিনার কি হয়েছে, বলো তো?'

'কি জানি! কেন?' জানতে চেয়েছে মুসা।

'অন্য একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা। আমাদের চেয়ে বয়েস বেশি। এ শহরের লোক নয়। আর রিকি ঘোরে একটা মেয়ের সঙ্গে। তাকেও এ শহরের ছেলেমেয়েরা কেউ কখনও দেখেনি। ঘটনাটা কি, বলো তো?'

'কি জানি! যার যেখানে ইচ্ছে ঘুরুক। আমি কি ওদের গার্জেন নাকি?'

'না, তা বলছি না। তবু···'

'দেখো, এ শহরের লোক নয় বলেই সন্দেহ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমিও তো এখানকার লোক নই। ট্যুরিস্ট সীজন। অপরিচিত লোক আসবেই।'

আলোচনাটা আর এগোতে দেয়নি মুসা। ওখানেই চাপা দিয়েছে।

জিনার কথা ভাবতেই মনে হলো ফোন করে। দিনের বেলায়ও কি জনের সঙ্গে বেরোবে ও? কে জানে। ঘড়ি দেখল। সাড়ে দশটা বাজে। ঢকঢক করে গিলে ফেলল এক গ্লাস কমলার রস। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গলায় আটকে গেল। ব্যথা লাগল। শুকিয়ে আছে কণ্ঠনালী।

জিনাদের নম্বরে ডায়াল করল সে।

তিন-চার বার রিঙ হওয়ার পর তুলে নিলেন জিনার আম্মা। 'হালো?'

'আন্টি? আমি মুসা। জিনা কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'এত বেলায়? ও তো সকাল সকালই উঠে পড়ে।'

'কি জানি, বুঝলাম না। ঘণ্টাখানেক গিয়ে অনেক ডাকাডাকি করে এসেছি। ঘুমই ভাঙে না। বলল, শরীর খারাপ লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে

না। এ রকম তো কখনও হয় না।'

'হুঁ!' কাল রাতে কখন ফিরেছে, জনের সঙ্গে কতক্ষণ ছিল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল মুসার। করল না। বলল, 'ঘুম ভাঙলে বলবেন সৈকতে যেতে। আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।'

লাইন কেটে দিল সে। ঘাড়ের পেছনটা চুলকাল। রান্নাঘরের মধ্যে আরও গরম। ভারী, ভেজা ভেজা বাতাস।

বেজায় গরম তো আজকে। ঘরে কিংবা বাগানে না থেকে সৈকতে যাওয়াই ভাল।

রিকিকে ফোন করল। সবে উঠেছে সে। ওকে বলল সৈকতে চলে যেতে। 'সঙ্গে বুগি বোর্ড নিয়ো। সাগরের অবস্থা জানি না এখনও। ঢেউ থাকলে সার্ফিং জমবে আজ।'

সৈকতে এসে দেখল ইতিমধ্যেই ভিড় জমিয়েছে সকালের সাঁতারুরা। ডোবাডুবি করছে, নীলচে সবুজ ছোট ঢেউ কেটে সাঁতরে যাচ্ছে এদিক ওদিক। হলুদ আর সাদা ডোরাকাটা একটা বড় ছাতার নিচে তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে আছে রিকি।

'আই, রিকি,' বলে এগিয়ে গেল মুসা।

'কি খবর?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল রিকি।

'বুগি বোর্ড আনোনি?'

আস্তে মাথা তুলে তাকাল রিকি, 'ভুলে গেছি।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের বোর্ডটা হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। বসে পড়ল বালিতে। পিঠে রোদ লাগছে। 'কাল রাতে কি করেছ? মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' হাই তুলল রিকি। 'লীলার সঙ্গে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ঘোরার পর সৈকতেও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হইনি। এত ক্লান্ত লাগছিল, সোজা বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছি।'

'ওঠো, সাঁতার কাটলেই শরীরের জড়তা চলে যাবে।'

সাড়া দিল না রিকি।

'আই, রিকি, চুপ করে আছ কেন?'

নীরবতা।

'রিকি?'

মুখের ওপর ঝুঁকে ভালমত দেখে মুসা বুঝল, রিকি ঘুমিয়ে পড়েছে।

হয়েছে কি ওর? অবাক হলো মুসা। সারারাত ঘুমিয়ে সকালে সৈকতে আসতে না আসতে ঘুমিয়ে পড়ল আবার, এই হট্টগোল আর রোদের মধ্যে!

ঘুমের মধ্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিকি। গড়িয়ে গিয়ে চিত হলো।

আরও একটা ব্যাপার অবাক লাগল মুসার। কোন ধরনের সানট্যান ব্যবহার করে রিকি? রোদে পুড়ে চামড়া তো বাদামী হবার কথা। তা না হয়ে হচ্ছে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য।

http://www.murchona.com

✡

সেদিন অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল লীলার দেহে। সৈকতে এসেছে খাবারের নেশায়। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে। কিন্তু কোন হোটেলে গিয়ে কিছু খেতে পারবে না। একটা জিনিস দিয়েই খিদে মেটাতে হবে।

রক্ত!

মানুষের রক্ত!

শুরু যখন করেছে, শেষ না করে উপায় নেই।

অন্যান্য রাতের মত আজও সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছে। শিকার ঠিকই করা আছে। গত কয় রাত তার রক্ত পান করেই কাটিয়েছে। আজও করবে। তবে আজ শেষ। এক শিকারে বেশিদিন চালানো যায় না। বড় জোর তিন কি চারবার রক্ত পান করা যায়। এর বেশি করতে গেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিকার। মেরে ফেললে পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। ঘাবড়ে যাবে লোকে। রাতে আর সৈকতে বেরোতে চাইবে না। শিকার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই রিকিকে একেবারে মেরে ফেলতে চায় না সে। শেষবারের মত তার রক্ত খাবে আজ।

রিকির আসার অপেক্ষাই করছে লীলা।

আসতে দেখা গেল ওকে। হাত নেড়ে ডাকল লীলা।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে অনেকটা বুড়ো মানুষের মত ঝুঁকে পা টেনে টেনে এগিয়ে আসতে লাগল রিকি।

হাঁটতে শুরু করল লীলা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নৌকা রাখার ডকটার দিকে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পেছনের পানিতে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে তিনটা নৌকা। গায়ে গায়ে ঘষা খেয়ে মৃদু শব্দ তুলছে।

'লীলা, কোথায় তুমি?' ক্লান্তস্বরে ডাকল রিকি।

'এই যে এখানে। এসো।'

রিকি আরও কাছে আসতে হাত ধরে তাকে ছায়ায় টেনে নিল লীলা। গলার শিরাটার দিকে তাকাল। তপতপ করে লাফাচ্ছে। ওটার ভেতরে বয়ে যাওয়া ঘন তরল পদার্থ চুমুক দিয়ে পান করার ইচ্ছেটা পাগল করে তুলল ওকে। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। ঘেন্না লাগত। ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন তো বরং ভালই লাগে। নেশা হয়ে গেছে। বাঘের যেমন হয়ে যায়। আফ্রিকার মাসাইদের যেমন হয়। জ্যান্ত গরুর শিরা ফুটো করে চুমুক দিয়ে রক্ত পান করে ওরা।

স্থির দৃষ্টিতে রিকির শিরাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল লীলা, 'রিকি, আজ কি করতে চাও?'

'সৈকতেই বসে থাকব। শহর ঘোরার কিংবা সাঁতার কাটার শক্তি নেই। কেন যেন বল পাচ্ছি না শরীরে। মাথাটাও থেকে থেকে ঘুরছে।'

ধপ করে বসে পড়ল রিকি।

ওর পাশে বসল লীলা। কাঁধে হাত রাখল।

মুখ তুলে তাকাল রিকি। মলিন হাসি হাসল।

জবাবে লীলাও হাসল।

মাথার ওপর কিচকিচ করে উঠল একটা বাদুড়।

তাকাল না রিকি। চেয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।

ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো লীলার। ঝকঝক করছে সাদা দাঁত। দুই কোণের দুটো দাঁত অস্বাভাবিক বড়। শ্বদন্ত। নেকড়ের দাঁতের মত।

এই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ করল রিকি। শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

কিন্তু কিছু করার নেই তার। গায়ে বল নেই। উঠে দৌড় দেয়ার ক্ষমতা নেই। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে লীলার মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল মুখটা। চেপে বসল রিকির গলার শিরাটার ওপর।

কুট করে সূচ ফোটার ব্যথা অনুভব করল রিকি।

শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল লীলার মুখটাকে।

পারল না। অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

চোখের সামনে দুলে উঠল আঁধারের পর্দা।

পেটের খিদেয় পাগলের মত চুষেই চলল লীলা। তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল রিকি। তারপরেও ছাড়ল না লীলা। টনক নড়ল, যখন আর রক্ত বেরোল না। শিরা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু পানির মত রস।

মুখ সরাল লীলা।

রিকির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। চাপা গোঙানি বেরোল হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে। এক ফোঁটা রক্ত রাখেনি রিকির শরীরে। খেতে খেতে মেরেই ফেলেছে।

খুন!

✡

ছোট্ট দ্বীপ। গাছের মাথায় ডানা ঝাপটাচ্ছে অসংখ্য বাদুড়। ছাই রঙ আকাশে বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করে ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে। নিচে খুদে সৈকতের ধারে কাঠের তৈরি কতগুলো পরিত্যক্ত কুঁড়ে। মানুষ বাসের নিদর্শন। তবে এখন আর থাকে না কেউ। চলে গেছে। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায় নেই। হয়তো এ বাধ্যবাধকতার কারণেই দ্বীপটা ছেড়ে গেছে মানুষ। তারপর থেকেই এটা বাদুড়ের দখলে।

জঙ্গলের মধ্যে দ্বীপের অন্ধকার একটা ঘরে অপেক্ষা করছে জন। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা কফিন। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে চন্দ্রালোকিত আকাশে বাদুড়ের ওড়া দেখছে।

শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। মুখে মৃদু হাসি। উড়ে বেড়ানো বাদুড়ের আনন্দ যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

আবহাওয়া বেশ গরম। দুঃখের বিষয়, এ রকম থাকে না সব সময়। গ্রীষ্মকালটা যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে যায় এই অঞ্চলে। আরও দীর্ঘ হলে সুবিধে হত। শিকার পাওয়া যেত অনেক বেশি। আরও দ্রুত কাজ শেষ হয়ে

যেত ওদের।

সাগরের দিক থেকে আসতে দেখা গেল লীলাকে। ঘরে ঢুকল। ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে আছে। মলিন মুখে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল।

'কি ব্যাপার, লীলা?' জানতে চাইল জন।

'খবর ভাল না, জন,' ধপ করে কফিনটার ওপর বসে পড়ল লীলা।

'কি হয়েছে?'

'রিকিকে খুন করে ফেলেছি।'

চমকে গেল জন। 'বলো কি!'

'হ্যাঁ। রক্ত খেতে গিয়ে হুঁশ ছিল না। এমন খাওয়াই খেয়েছি, তবে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছি ওকে।...আর আমারই বা কি দোষ বলো? পেটে এত খিদে থাকলে করবটা কি?'

'সর্বনাশ করেছ! পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। কোনমতে আমাদের কথা জেনে গেলে আর রক্ষা নেই, ধাওয়া করে আসবে দ্বীপে।'

'জানবে কি করে আমরা এখানে আছি?'

ভেবে দেখল জন। 'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু...'

'তা ছাড়া আমিই যে খুন করেছি, তার কোন প্রমাণ নেই। লাশটাকে সাগরে ফেলে দিয়ে এসেছি। ওরা ভাববে ডুবে মারা গেছে রিকি। ময়না তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারবে না। গলার ফুটো দুটো দেখে বড়জোর অবাক হবে, কিসের চিহ্ন বুঝতেই পারবে না।'

'আমি ভাবছি অন্য কথা। সৈকতে রহস্যময় খুন হতে দেখে রাতের বেলা যদি আসাই ছেড়ে দেয় লোকে, আমরা বাঁচব কি খেয়ে?'

'যা করার তো করে ফেলেছি। আগে থেকেই অত ভেবে লাভ নেই। বসে থাকি। দেখি, কি হয়।'

আট

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। ঘামে ভেজা চাদরটা গায়ের ওপর থেকে টান মেরে সরিয়ে ফেলে উঠে বসল। নেমে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। পাখি ডাকছে। পুবের আকাশে ধূসর আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে।

'কটা বাজল?' জোরে জোরেই নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

চোখ ফেরাল ঘড়ির দিকে।

সাড়ে পাঁচটা—ধীরে ঘোষণা করল যেন ঘড়িটা।

ঘুম ভাল হয়নি। সারারাত ছটফট করেছে। এপাশ ওপাশ করেছে। মনের মধ্যে কি জানি কেন একটা অশান্তি।

রিকির কথা ভেবে। জিনার কথা ভেবে। দুজনের আচরণই বিস্ময়কর রকম বদলে গেছে।

সন্ধ্যায় সৈকত থেকে ফিরে জিনাকে ফোন করেছিল সে। খুব ব্যস্ত ছিল লাইনটা। সারাক্ষণ এনগেজ টোন। ডিনারের পর আবার করেছে। ধরেছেন জিনার আম্মা।

জিনা ঘরে নেই। বেরিয়েছে। নিশ্চয় জনের সঙ্গে, শঙ্কিত হয়ে ভেবেছে মুসা। আশঙ্কাটা কিসের, বুঝতে পারছে না।

জিনার সঙ্গে ভালমত কথা বলতে হবে—ঠিক করেছে সে। গলদটা কোনখানে জানা দরকার।

ওর চোখের সামনেই ফর্সা হতে থাকল আকাশ। পাখির কলরব বাড়ছে।

এখন বিছানায় ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয় না। ঘুম আর আসবে না। তারচেয়ে সৈকতে গিয়ে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করে এলে অস্থির মনটা শান্ত হতে পারে।

আলমারি খুলে একটা কালো রঙের স্প্যানডেক্স বাইসাইকেল শর্টস বের করে পরল। পায়ে ঢোকাল রানিং শু। দক্ষ হাতে কয়েক টানে বেঁধে নিল ফিতে দুটো।

বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে টেনে দিল দরজাটা। ভোরের শীতল বাতাস শিশিরে ভেজা। একসারি কটেজের পাশ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। সাগরের দিক থেকে আসছে নোনা শুঁটকির গন্ধ।

সৈকতের কিনারে এসে পানিকে একপাশে রেখে গতি বাড়িয়ে দিল সে। কালচে-ধূসর আকাশের ছায়া পড়েছে পানিতে। কালির মত কালো লাগছে পানি। ওকে এগোতে দেখে চারদিকে দৌড়ে সরে যাচ্ছে সী গাল। বেশি কাছাকাছি হলে তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে আকাশে উঠে পড়ছে।

নির্জন সৈকত। কেউ বেরোয়নি এত ভোরে। শরীর চর্চা যারা করে, অথবা বহুমূত্র কিংবা রক্তচাপের রোগী, তারাও নয়। সে একা।

ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকা দিগন্তরেখার কাছে একটা জাহাজের কালো অবয়ব চোখে পড়ছে। কোন ধরনের বার্জ হবে। এই আলোয় কেমন বিকৃত হয়ে গেছে আকৃতিটা, ছায়ার মত কাঁপছে। বাস্তব লাগছে না। মনে হচ্ছে ভুতুড়ে জাহাজ।

গতি কমিয়ে দিল মুসা। তবে দৌড়ানো বন্ধ করার কোন ইচ্ছে নেই। এগিয়ে চলল দৃঢ়পায়ে। একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশ কাটিয়ে এল। পুরোপুরি নেভেনি ওটা। কালো ছাইয়ের ভেতরে এখনও ধিকিধিকি আগুন। পোড়া একটা কাঠ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার সেটা ফিরিয়ে এনে ফেলে রেখেছে সৈকতে। বালিতে মরে পড়ে আছে দুটো স্টারফিশ।

নোনা পানির কণা এনে চোখেমুখে ফেলছে বাতাস। ভেজা বালিতে মচমচ শব্দ তুলছে ওর জুতো। ধূসর রঙকে হালকা পর্দার মত সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে ভোরের রক্তলাল আকাশ। সেই রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে সাগরেও।

দারুণ সুন্দর। দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। চোখ তুলে তাকালেই সামনে দেখা যাচ্ছে

amarsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

বালিয়াড়ির ওপারে কালচে পাহাড়ের চূড়াটা।

যতই এগোচ্ছে সেদিকে, পায়ের নিচে নুড়ির পরিমাণ বাড়ছে। বালি কম। মাটি শক্ত। পাহাড়ের ছায়া থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকা ডকটাও চোখে পড়ছে এখন।

আরও এগোতে ডকের কাছে পানিতে কি যেন একটা ভাসতে দেখা গেল।

কোন ধরনের ছোট নৌকা? দূর থেকে ভালমত বোঝা যাচ্ছে না।

পানিতে লাল রোদের ঝিলিমিলি। স্পষ্ট হচ্ছে জিনিসটা। একটা নৌকার পাশে ডুবছে, ভাসছে।

তিমির বাচ্চা নাকি? তীরের কাছে এসে অল্প পানিতে আটকা পড়েছে? নাকি মরে যাওয়া বড় কোন মাছ?

ডকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছে। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে জিনিসটা কি দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।

কয়েক পা গিয়েই যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গলার কাছে আটকে আসতে লাগল দম।

পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। দুই হাত দুই পাশে ছড়ানো। ভঙ্গিটা মোটেও স্বাভাবিক না।

কোন চিন্তাভাবনা না করেই পানিতে নেমে পড়ল মুসা। গোড়ালি ডুবে গেল ঠাণ্ডা পানিতে। উত্তেজনায় জুতো খোলার কথাও মনে ছিল না। ভিজে গেছে। এখন আর খুলেও লাভ নেই। মানুষটার কোমর ধরে টান দিল। বেশ ভারী। মুখের দিকে না তাকিয়েই কাঁধে তুলে নিল। বয়ে নিয়ে এল তীরে। শুইয়ে দিল বালিতে।

প্রায় নগ্ন দেহটা কাটাকুটিতে ভরা। ডকের কাছের ধারাল পাথরে ক্রমাগত বাড়ি খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। একটা কাটা থেকেও রক্ত বেরোচ্ছে না।

মুখ দেখার জন্যে চিত করে শুইয়েই চিৎকার করে উঠল মুসা।

রিকি!

দ্রুত একবার পরীক্ষা করেই নিশ্চিত হয়ে গেল, মারা গেছে রিকি।

ডুবল কি করে? সাঁতার তো ভালই জানত। নাকি ভাটার সময় নেমেছিল পানিতে, স্রোতে টেনে নিয়ে গেছে? জোয়ারের সময় আবার ফেলে গেছে সৈকতে?

রিকি মৃত! নিজের অজান্তেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল মুসার। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বালিতে। বুজে এল চোখ।

[illegible] খারাপ সাঁতারু ছিল না রিকি। জোয়ারের কথা নয়, যদি তীব্র ভাটার সময় না নেমে থাকে। কিন্তু রাতের বেলা নামতে গেল কেন সে?

'কেন, রিকি, কেন নামলে?' চোখ খুলে আচমকা চিৎকার করে উঠল মুসা। চোখে লাগছে কমলা রঙের রোদ। আবার মুদে ফেলল চোখ।

কতক্ষণ একভাবে বসে ছিল সে, বলতে পারবে না। মানুষের কথা শুনে

দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। এগিয়ে আসতে দেখল দুজন জেলেকে।

নয়

চার রাত পর। আবার ঘুম আসছে না মুসার। বিছানায় গড়াগড়ি করছে। ছটফট করছে। চাদরটা এলোমেলো। বালিশগুলো মেঝেতে। অনেক চেষ্টায় তন্দ্রামত যা-ও বা এল, দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল।

রিকিকে দেখল সে।

অনেক বড় একটা সৈকত। ঝলমলে রোদে বালিকে লাগছে সোনালি। বড় বড় ঢেউ মাথা উঁচু করে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে এসে আছড়ে পড়ছে সৈকতে। ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে মাথায় করে বয়ে আনা সাদা মুকুট।

খালিপায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাজির হলো রিকি। পরনে কালো রঙের সাঁতারের পোশাক। পানির কিনার ধরে দ্রুতপায়ে দৌড়াচ্ছে। কোন শব্দ হচ্ছে না। নিঃশব্দে উড়ে চলেছে যেন বালির ওপর দিয়ে।

তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল মুসা। ফিরে তাকাল না রিকি। মুসাকে কাছে যেতে দিল না। মুসা এগোলে সে-ও গতি বাড়িয়ে দিয়ে সরে যায়।

রোদে আলোকিত সৈকতেও রিকির মুখটা স্পষ্ট নয়। ছায়ায় ঢেকে রয়েছে যেন।

'প্লীজ, রিকি,' সামনে ঝুঁকে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছে মুসা, 'একটু দাঁড়াও। তোমার চেহারাটা দেখতে দাও।'

তার অনুরোধেই যেন ফিরে তাকাল রিকি।

চমকে গেল মুসা।

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে রিকির মুখ। ঠেলে বেরোনো চোখ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে চিৎকারের ভঙ্গিতে।

হঠাৎ কালো হয়ে এল আকাশ। বিশাল ছায়া পড়ল সৈকতে।

ছায়াটা অনুসরণ করে চলল রিকিকে। এত জোরে ছুটেও কিছুতেই ওটার সঙ্গে পেরে উঠছে না সে।

এখনও রোদের মধ্যেই রয়েছে রিকি, তবে দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে ছায়াটা। যেন ওকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে।

দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছে মুসার। বুঝতে পারল, ছায়াটা মেঘের নয়, হাজার হাজার কালো প্রাণী সূর্যকে ঢেকে দিয়ে এই অবস্থা করেছে।

কালচে বেগুনী পাখা দুলিয়ে উড়ছে ওগুলো। ওড়ার তালে তালে ওঠানামা করছে মাথাগুলো। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে।

বাদুড়ের ঝাঁক তাড়া করেছে রিকিকে।

হাজার হাজার বাদুড় ডানা ঝাপটে, প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, কালো চাদর তৈরি করে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। ছায়ায় ঢাকা পড়েছে সৈকত। ওদের তীক্ষ্ণ

চিৎকার ঢেউয়ের গর্জনকেও ঢেকে দিয়েছে।

গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে রিকির। চোখ বুজে ফেলল সে। কিন্তু মুখটা খোলাই রইল আতঙ্কে।

'থেমো না, রিকি!' মুসা বলল। 'দৌড়াতে থাকো!'

কিন্তু কুলাতে পারল না রিকি। ধরে ফেলল ওকে বাদুড়েরা। হুমড়ি খেয়ে বালিতে পড়ে গেল সে। রাতের অন্ধকারের মত ছেকে ধরল ওকে বাদুড়গুলো।

তারপর সব কালো।

ঝটকা দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। নিজের ঘরে রয়েছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জানালা দিয়ে ভোরের ধূসর আলো ঢুকছে।

বিছানা থেকে যখন নেমে দাঁড়াল সে তখনও ঘুম পুরোপুরি কাটেনি। চোখে লেগে রয়েছে দুঃস্বপ্নের রেশ।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জানালার দিকে এগোল সে। কানে বাজছে যেন বাদুড়ের তীক্ষ্ণ চিৎকার। চোখের সামনে দেখছে বাদুড়ের মেঘ! বাদুড়ের ঝাঁক! সৈকতের বালিতে হুমড়ি খেয়ে পড়া রিকিকে কালো চাদরের মত ঢেকে দিয়েছে!

জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভয়ঙ্কর সেই দুঃস্বপ্নের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা চালাল সে।

কিন্তু বাদুড় দেখল কেন?

স্বপ্ন বিশ্বাস করে না সে। ঘুমের মধ্যে তাহলে কি তার মগজ কোন জরুরী মেসেজ দিতে চেয়েছে? এত প্রাণী থাকতে নইলে বাদুড় কেন?

তবে কি ভ্যা···একটু দ্বিধা করে জোরে জোরে উচ্চারণই করে ফেলল সে: ভ্যাম্পায়ার!

না, ভূতের কথা ভাবছে না সে। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা ভাবছে। ছোট দ্বীপটা থেকে রাতের বেলা ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ে আসতে দেখেছে। বেশির ভাগই নিরীহ ফলখেকো বাদুড়। তবে বড় বাদুড়ের সঙ্গে ছোট আকারের ভ্যাম্পায়ার ব্যাট বাস করাও অসম্ভব নয় ওই নির্জন দ্বীপে।

রক্তচোষা ওই ভয়ঙ্কর বাদুড়গুলোই কি হত্যা করেছে রিকিকে? অসম্ভব নয়। রাতের বেলা সৈকতের নির্জন জায়গায় চলে যেত রিকি। নিজের অজান্তেই ভ্যাম্পায়ারের শিকার হত। চুপচাপ এসে তার শরীর থেকে রক্ত খেয়ে চলে যেত ওগুলো। সেজন্যে দুর্বল বোধ করত, সকালে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করত না। আমাজানের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরতে গিয়ে ওই বাদুড় সম্পর্কে বিরাট অভিজ্ঞতা হয়েছে মুসার। জানে, কি রকম নিঃশব্দে এসে গায়ে বসে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। রক্ত খেয়ে চলে যায়। জানা না থাকলে, আর সজাগ এবং ওগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক না থাকলে কিছু টেরই পাওয়া যায় না।

যতই ভাবল, রিকির রহস্যময় মৃত্যুর আর কোন কারণই খুঁজে পেল না মুসা। সব খুনেরই মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। এ খুনের কোন মোটিভ পায়নি

পুলিশ। তারমানে ভ্যাম্পায়ার। রক্ত খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে রিকিকে। এটাই মোটিভ। এবং জোরাল মোটিভ।

স্বপ্ন একটা বিরাট উপকার করেছে তার। সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছে।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে মুসা। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর চোখে। কুঁচকানো টেনিস শর্টসটা তাড়াতাড়ি পরে নিল। মাথায় গলিয়ে গায়ে টেনে দিল আগের দিনের ব্যবহার করা টি-শার্ট। রওনা দিল দরজার দিকে। দাঁত ব্রাশ করার কিংবা মুখ ধোয়ারও প্রয়োজন মনে করল না।

রান্নাঘর দিয়ে ছুটে বেরোনোর সময় নাস্তার টেবিল থেকে ডাক দিলেন তার বাবা, 'এই···'

কিন্তু ততক্ষণে স্ক্রীনডোরের বাইরে চলে এসেছে সে। 'পরে কথা বলব,' বলে ছেড়ে দিল পাল্লাটা। লাফ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে দৌড়াতে শুরু করল জিনাদের বাড়ির দিকে।

ধূসর রঙ আকাশের। বাতাস ভেজা ভেজা, কনকনে ঠাণ্ডা। বালি ভেজা। তারমানে আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়নি সে। বাইরের কোন শব্দই তার কানে ঢুকতে দেয়নি ভয়াবহ ওই দুঃস্বপ্ন। প্রথমে সাগরের ঢেউয়ের গর্জন। তারপর বাদুড়ের বাঁশির মত তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!

জিনাকে গিয়ে বলতে হবে। বলবে, সত্যটা জেনে গেছে সে।

ঝলমলে রোদ ছিল, আকাশটা নীলও ছিল; তারপরেও রিকির মৃত্যুর পর গত চারটা দিন কেমন যেন ধূসর, বিষণ্ণ কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছিল সব কিছু। মনটা ভীষণ খারাপ ছিল বলেই মুসার কাছে দিনগুলো এ রকম লেগেছে।

ঘটনার ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে তার মনে, কেবল চিৎকার আর শব্দগুলো গেঁথে রয়েছে স্পষ্ট—রিকির বাবা-মায়ের বুকভাঙা কান্না, পুলিশের ভারী ও চাপা কণ্ঠ, সৈকতে বেড়াতে আসা ছেলেমেয়েদের চমকে চমকে ওঠা, ভীত কথাবার্তা।

গত চারদিনে জিনার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে তার। জিনা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে তার সঙ্গে। রিকির মৃত্যু রহস্য নিয়ে আলোচনাটা মোটেও জমেনি।

গত কয়েকদিনে বার বার কিশোর আর রবিনের অভাব অনুভব করেছে মুসা, বিশেষ করে কিশোরের। এখন ওর এখানে থাকার বড় দরকার ছিল। টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। রবিনকে পাওয়া গেছে। ব্যাভেজ খোলা হয়েছে। তবে ঠিকমত হাঁটাচলা করতে সময় লাগবে। আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন ডাক্তার। ইয়ার্ডে পাওয়া যায়নি কিশোরকে। দুই বাঙালিয়ান ভাইয়ের একজন বোরিস জানিয়েছে, রাশেদ পাশার সঙ্গে বাইরে গেছে সে, পুরানো মাল আনতে, কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই। হতাশ হয়ে লাইন কেটে দিয়েছে মুসা।

জিনার সঙ্গে আলোচনা জমাতে না পেরে সরে চলে এসেছিল মুসা। ভেবে

অবাক হচ্ছিল, কি হয়েছিল রিকির? এত রাতে সাগরে নেমেছিল কেন? মারা গেল কেন? ওই অবেলায় শুধু শুধু সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি, এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না মুসা।

টাউন করোনার এটাকে 'দুর্ঘটনায় মৃত্যু' রায় দিয়েই খালাস। কিন্তু মুসা এত সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না ব্যাপারটা। বুঝতেও পারছিল না কিভাবে মারা গেছে রিকি।

তবে এখন জানে। স্বপ্ন তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে।

সেই জবাবটা জিনাকেও জানাতে চলেছে সে।

গ্রীষ্মাবাসগুলোর পেছন দিয়ে এগোচ্ছে। সাদা সাদা কটেজগুলোর আঙিনায় চওড়া স্যানডেক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চেয়ার। একটা করে বড় ছাতা আর তার নিচে টেবিল রয়েছে প্রতিটি আঙিনায়। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে জিনাকে চোখে পড়ল।

লাফ দিয়ে ডেকে উঠল মুসা। জিনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলে এল পেছনের দরজার কাছে।

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল টেবিলে বসা জিনা। কেরিআন্টি এটো থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন।

দৌড়ে আসার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে মুসা।

'নাস্তা করেছ?' জানতে চাইলেন কেরিআন্টি। টেবিলে রাখা প্যানকেকের থালাটা দেখালেন তিনি।

কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে খাবারের দিকে এগোল না মুসা। জিনাকে দেখছে। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে আসা ধূসর আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে ওর মুখ। 'জিনা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নীরবে উঠে দাঁড়াল জিনা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ওর পিছু পিছু ডেকে বেরিয়ে এল মুসা। কথাটা জানানোর জন্যে অস্থির। সাগর থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। আকাশের ভারী মেঘ অনেক নিচে নেমে এসেছে।

ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল মুসা। শার্টের নিচের সংশটা ওপরে টেনে তুলে সেটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

গন্ধ হয়ে গেছে শার্টটায়। নাক কুঁচকাল। তাড়াহুড়ায় আলমারি থেকে ধোয়া শার্ট বের করে পরার কথা মনে ছিল না, আগের দিনেরটাই পরে চলে এসেছে। এ নিয়ে মাথা ঘামাল না।

'কেমন কাটছে তোমার?' মেঘলা আকাশের নিচে গাছপালার কালো মাথার দিকে তাকিয়ে কিছুটা নিশ্চিত হয়েই যেন জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ভাল না।'

'আমারও না।'

'তোমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে এসেছি, জিনা,' ভূমিকা শুরু করল মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে। ও যা বলবে, সেটা যদি বিশ্বাস না করে জিনা?

হাসাহাসি করে?

'আমার ঘুম পাচ্ছে। তাজা বাতাসেই বোধহয়।'

'জিনা, আমি কি বলছি, শুনছ? রিকি কিভাবে মারা গেছে, জেনে ফেলেছি।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল জিনা। রক্ত সরে গিয়ে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। 'কিভাবে মারা গেছে, সেটা আমিও জানি, মুসা। পানিতে ডুবে।'

'জিনা, শোনো, প্লীজ,' অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের শার্টের ঝুল ধরে একটানে প্রায় হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল মুসা। 'প্লীজ, জিনা!'

জবাব দিল না জিনা। মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'জবাবটা স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছি আমি,' গলা কাঁপছে মুসার। 'কিন্তু আমি জানি, এটাই সত্যি।'

এবারও কোন কথা বলল না জিনা। তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'ভ্যাম্পায়ারে খুন করেছে রিকিকে।'

'তাই!' এক পা পিছিয়ে গেল জিনা। এমন করে দু'হাত তুলে ধরল, যেন মুসার কথার অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।

'ভ্যাম্পায়ার!' জোর দিয়ে বলল মুসা। সৈকতের ওপর দিয়ে হাজার হাজার বাদুড় উড়ে যেতে দেখি রোজ। বেশির ভাগই ফলখেকো বাদুড়। আমার বিশ্বাস, ফলখেকোগুলো যেখান থেকে আসে, সেখানে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটও আছে। রিকিকে...'

'মুসা, থামো। এ সব রসিকতা এখন ভাল্লাগছে না আমার,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল জিনা। দুই হাত আড়াআড়ি করে রাখল বুকের ওপর।

জিনাকে বোঝাতে গিয়ে ওর গলার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল মুসা। 'খাইছে' বলে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

নানা রকম ভাবনা খেলে যেতে শুরু করল মাথায়। অদ্ভুত সব ভাবনা। সেগুলো বলতে গেলে পাগল বলবে জোরে।

উল্টোপাল্টা দেখছি নাকি আমি?—ভাবল সে। ওগুলো মশার কামড়?

জনের কথা মনে পড়ল তার। জন! এমন কি হতে পারে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট নয়, আসল ভ্যাম্পায়ারের কবলেই পড়েছে জিনা? জন কি ড্রাকুলার মত মানুষরূপী সত্যিকারের রক্তচোষা ভূত?

মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে! আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি! ভাবতে লাগল মুসা।

'স্বপ্নে কি দেখেছি আমি, শোনো,' আবার যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরেই কথা বলতে লাগল মুসা। মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাগুলো। 'বাদুড়ের তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল রিকি, আর বাদুড়গুলো...'

'থামো, মুসা!' ফেটে পড়ল জিনা। 'বললাম তো, ভাল্লাগছে না আমার!'

'কিন্তু আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি!' জিনার রাগের পরোয়া করল না

http://www.murchona.com

মুসা। 'বোঝার চেষ্টা করো, জিনা। ওই বাদুড়গুলোই যত নষ্টের মূল। রিকি···ওর গলায় এত বেশি কাটাকুটি ছিল, তার মধ্যেও···'

'আহ্, থামো না!' রাগে শক্ত হয়ে গেছে জিনার শরীর। 'দয়া করে তোমার বকবকানি থামাও।'

'কিন্তু, জিনা···'

'থামো!' গর্জে উঠল জিনা।

থমকে গেল মুসা। ভুলটা কি বলল সে? ওর কথা কেন শুনতে চাইছে না জিনা? বিশ্বাস করুক বা না করুক, কথা তো শুনবে!

'মুসা, তোমার বয়েস বেড়েছে। আগের ছোট্ট খোকাটি আর নেই তুমি যে সব সময় ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে থাকবে। এখন আর ওসব মানায় না,' তামাটে চোখে রাগে যেন আগুন জ্বলছে জিনার। মুসার কাছে ওর এই আচরণ রীতিমত অস্বাভাবিক লাগল। 'বড় হও,' জিনা বলছে। 'তোমার এত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু মারা গেল, আর তুমি বসে বসে হরর ছবির গল্প তৈরি করছ!'

'না, তা করছি না···' চিৎকার করে উঠল মুসাও।

কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিল না জিনা। 'দেখো, জীবনটা কাহিনী নয়, বাস্তব।'

আশ্চর্য! কবে এত বড় হয়ে গেল জিনা? রকি বীচ থেকে আসার সময়ও তো এরকম ছিল না। স্যান্ডি হোলোতে এসে মাত্র ক'দিনে···

'জীবনটা যে কাহিনী নয়, আমি জানি,' তর্ক করতে গেল মুসা, 'কিন্তু···'

'রিকি আমাদের বন্ধু ছিল,' চোখের কোণে পানি এসে গেছে জিনার। 'ওর মৃত্যুতে তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, আমারও হচ্ছে। মেনে নেয়া কঠিন। কিন্তু এটাই বাস্তব।' চোখের পানি গোপন করার চেষ্টা করল না জিনা। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। 'কিভাবে মারা গেছে ও, ঠিক করে বলতে পারছে না কেউ। পানিতে ডুবে মরেছে, এ কথাটা মানতে না চাইলে না মানো, তাই বলে ভ্যাম্পায়ারের গল্প! ওই ছেলেমানুষী গল্প দয়া করে আমাকে শোনানোর চেষ্টা কোরো না আর।'

'লেকচার তো একখান ভালই দিয়ে নিলে। কিন্তু, জিনা···' থমকে গেল মুসা। আর কি বলবে? তাকিয়ে আছে জিনার গলার দাগ দুটোর দিকে।

'জন একটা ভ্যাম্পায়ার!' বিড়বিড় করে বলে ফেলল নিজেকেই। জিনাকে শোনানোর জন্যে বলেনি।

কিন্তু শুনে ফেলল জিনা। হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'কি বললে? পাগল হয়ে গেছ তুমি। যাও এখান থেকে। আমার সামনে থেকে সরো। তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। গটমট করে রওনা হলো ঘরে ঢোকার জন্যে।

মুসাও ঢুকতে গেল। দরজার কাছ থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল জিনা। 'না, আসার দরকার নেই। যাও! আর কোনদিন আসবে না এখানে। তোমার মুখও দেখতে চাই না।'

ভেতরে ঢুকে গেল জিনা। কেরিআন্টি বোধহয় নেই এখন ওঘরে, কিংবা ওদের কথা শুনতে পাননি, তাই কোন রকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো না। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। নেমে এল ডেক থেকে। ক্লান্ত, চিন্তিত ভঙ্গিতে ফিরে চলল। সামনে দিয়ে দৌড়ে পার হয়ে গেল দুটো খরগোশ। দেখলই না যেন সে।

বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অঝোরে ঝরতে শুরু করল।

মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটছে মুসা। বৃষ্টিতে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। দুশ্চিন্তায় বৃষ্টির চেয়ে অনেক ভারী হয়ে আছে যেন মগজ।

পানি আর কাদায় জুতো পড়ে ছপছপ শব্দ তুলছে। ওর তারের মত চুলগুলোকে নরম করতে পারছে না পানি, লেপ্টে দিতে পারছে না। তবে শার্টটা ভিজে চুপচুপে হয়ে লেগে গেছে গায়ের সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতে চলেছে সে। জিনা ঠিকই বলেছে, ছেলেমানুষী, উদ্ভট চিন্তা। ভ্যাম্পায়ারের কথা কি করে ভাবতে পারল? কিশোর হলে এরকম ভূতুড়ে ভাবনা কক্ষনো ভাবত না। ভ্যাম্পায়ারের কথা না ভেবে বাস্তব কিছু আবিষ্কার করত।

কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ভূত অবাস্তব হলেও ভ্যাম্পায়ার বাদুড় তো বাস্তব। ওরা রক্ত খেয়ে রিকিকে···

তাহলে জিনার গলায় দাগ কেন? ভ্যাম্পায়ার ব্যাট রক্ত খেলে ওরকম দাগ রেখে যায় না।

মাথাটা আবার গরম হয়ে যাচ্ছে। একপাশের গাছগুলোর দিকে মুঠো তুলে ঝাঁকাল সে, যেন শাসাল ওগুলোকে। বৃষ্টি আর বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে গাছের মাথা।

ঘাড় বেয়ে বৃষ্টির পানি অঝোরে ঝরে পুরো ভিজিয়ে দিয়েছে পিঠ। শীত লাগল ওর। গায়ে কাঁটা দিল।

আবার ভাবতে লাগল ভ্যাম্পায়ারের ভাবনা। জিনার গলার দাগ দুটো নিয়ে ভাবল। কাকে সন্দেহ করবে? জনকে? না ভ্যাম্পায়ার ব্যাটকে?

দশ

নীলচে আলোর বিকেলে গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল জন। কেবিনের ভেতরে হাত নাড়ানোর জায়গা নেই, তার মধ্যেই আড়মোড়া ভাঙল কোনমতে। ডালার বড় বড় ফুটোগুলো দিয়ে আলো আসছে। তবে এত কম, বোঝা যায় বাইরে দিনের আলো শেষ।

বড় করে হাই তুলে ডালায় ঠেলা দিল সে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে ওপরে উঠে গেল ডালাটা। উঠে বসে চারপাশে তাকাল। তারপর বেরিয়ে এল

কফিন থেকে।

হালকা স্যান্ডেলের শব্দে ফিরে তাকাল সে। ওপাশের ঘর থেকে দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকল লীনা। 'কি খবর? ঘুম তাহলে ভাঙল।'

'তুমি এত আগে জেগেছ কেন?'

'খিদে। বড্ড খিদে। সহ্য করতে পারছি না। পেটে খিদে নিয়ে কি ঘুম আসে?'

'কি আর করা। সহ্য করতেই হবে। আগেই তো বলা হয়েছে আমাদের, এ রকমই ঘটবে…'

'তা হয়েছে। নাম লিখিয়েছি পিশাচের খাতায়। এখন যে বাঁচি না!'

'আর কোন উপায় নেই, চালিয়ে যেতেই হবে। একবার যখন ফাঁদে পা দিয়েছি, আর মুক্তি নেই। এখন বেরোতে গেলে কাউন্ট ড্রাকুলার বিশ্বাস হারাব। আর তার বিশ্বাস হারালে কি যে ঘটে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছ। বেশি ভাবনাচিন্তা না করে তৈরি হয়ে নাও। বেরোতে হবে। শিকার তো একটাকে দিয়েছ শেষ করে। আজ কি করবে?'

'দেখি, নতুন কাউকে ধরার চেষ্টা করতে হবে।'

'কাকে? পরিচিত কাউকে?'

'ঠিক করিনি এখনও। ভেবে দেখতে হবে।'

☆

'সারাটা দিন কি করে কাটালে?' উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল টনি।

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। ঘাসের ডগায় পানি লেগে আছে। হাঁটতে গেলে নাড়া লেগে পায়ে পড়ে পা ভেজে। মুসার মনে হলো, বোকামি হয়ে গেছে। শর্টস না পরে জিনস পরে আসা উচিত ছিল। বিড়বিড় করে বন্ধুর কথার জবাব দিল, 'কিছুই না।'

আসলেই কিছু করেনি সে। বেশির ভাগ সময় লিভিং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে, পায়চারি করেছে, রিকির লাইটারটা বের করে হাতে নিয়ে দেখেছে, স্বপ্নের কথা ভেবেছে, জিনা ওর কথা না শুনে তাড়িয়ে দেয়ায় দুঃখ পেয়েছে।

লাইটারটা এখনও হাতেই আছে ওর। রাখতে ভাল লাগছে। বন্ধুর একমাত্র স্মৃতি।

'বালি শুকিয়ে যাচ্ছে দেখো, কত তাড়াতাড়ি,' স্যান্ডেলের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল টনি, 'কি আশ্চর্য, তাই না? সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি হলো, আর কত সহজেই না সেটা শুষে নিল বালি।'

সাগরের দিকে তাকাল মুসা। সন্ধ্যার ওরদে মেঘগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছে। রাতের আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। দিগন্তে ফ্যাকাসে চাঁদের চারপাশ ঘিরে পানির একটা নীলচে বৃত্ত তৈরি হয়েছে।

'কি ভাবছ এত?' মুসাকে জবাব দিতে না দেখে জিজ্ঞেস করল টনি।

টান দিয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করল মুসা।

'কি, বলছ না যে? অ্যাই, মুসা?'

'কি বলব?'

'যা ভাবছ।'

'বললে বিশ্বাস করবে না। হয় হাসবে, নয়তো জিনার মত রেগে গিয়ে দর্শন শোনাতে শুরু করবে।'

'মানে?'

'স্বপ্ন দেখে একটা কথা মাথায় এসেছিল। জিনাকে বলতে গিয়েছিলাম। দূর দূর করে খেদিয়েছে আমাকে।'

'আমি ওরকম কিছু করব না। নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।'

তা-ও দ্বিধা করতে লাগল মুসা। টনির চাপাচাপিতে শেষে বলতে বাধ্য হলো স্বপ্নের কথা, রিকি কিভাবে মারা গেছে, সেই সন্দেহের কথা। ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথাই শুধু বলল সে। জনকে যে ভ্যাম্পায়ার ভাবছে এ কথা চেপে গেল।

নিজে হাসল না টনি, যেহেতু কথা দিয়েছে। তবে জিনার কথা বলল, 'হাসবেই তো। ছেলেমানুষের মত কথা বললে কে না হাসে।'

'তুমিও বললে ছেলেমানুষ! জানো, স্বপ্ন অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অনেক আবিষ্কার, অনেক যুদ্ধ…'

'থামো, থামো,' হাত তুলল টনি, 'ওসব আমি জানি। ওগুলো ছিল সব বাস্তব…'

'এটা অবাস্তব, এই বলবে তো? কিন্তু টনি, ভুলে যেয়ো না, রিকির মৃত্যুটা বাস্তব।'

'কে ভুলে যাচ্ছে? রিকির মৃত্যুটা বাস্তব। আর বাস্তব কারণেই সেটা ঘটেছে, পানিতে ডুবে। তুমি কি ভেবেছ, জিনা আর আমি শুনলেই তোমার কথায় লাফিয়ে উঠব? ভ্যাম্পায়ারে রক্ত শুষে খেয়ে খেয়ে খতম করে দিয়েছে রিকিকে—দারুণ এই আবিষ্কারের জন্যে তোমাকে বাহবা দিতে থাকব, পিঠ চাপড়াব?'

টনির দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। আহত স্বরে বলল, 'জিনাকে আমি বলতে গিয়ে বোকামি করে ফেলেছি, এটা ঠিক। সেই দুঃখ ভোলার জন্যে কারও ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলাম, সে তুমি। কিন্তু তুমিও যে এভাবে হাসাহাসি শুরু করবে…'

হাসি মুছে গেল টনির মুখ থেকে। তাড়াতাড়ি বলল, 'সরি। তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্যে বলিনি কিন্তু।'

মাথার ওপর দিয়ে কাপটানোর শব্দ তুলে তাকাল মুসা। দুটো বাদুড় উড়ে চলেছে বালিয়াড়ির দিকে।

'বিজ্ঞানের ক্লাসে স্যার বলেছেন, বাদুড় খুব ভাল প্রাণী,' ঘাসের ডগা চিবাচ্ছে টনি, কথা স্পষ্ট হলো না। 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওদের প্রয়োজন আছে। ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ওরা আমাদের উপকার করে। বাদুড়ের মল দিয়েও ভাল সার হয়।'

'ওই সার তুমি গিয়ে জমিনে ফেলোগে!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'আর জাহান্নামে যাক তোমার বিজ্ঞানের ক্লাস।'

রাগ করল না টনি। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। রিকির কথাটাও মন থেকে সরাতে পারছি না। বেচারা! তা ছাড়া জিনার সঙ্গে ওই অপরিচিত লোকটার খাতির···'

'বাদ দাও ওসব কথা,' হাত নেড়ে বলল মুসা। নিজের কর্কশ স্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। 'ভাল্লাগছে না শুনতে!'

কোন কথা বলেই আর জমানো যাবে না বুঝতে পেরে টনি বলল, 'তারচেয়ে চলো প্রিন্সেসে চলে যাই। মন ভাল হবে। যাবে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না। তুমি যাও। আমি বরং হাঁটাহাঁটি করে মগজটাকে সাফ করা যায় নাকি দেখি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টনি। 'ঠিক আছে, মন ভাল করার চেষ্টা করতে থাকো তুমি। আমি গেলাম।'

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল সে। কিছুদূর গিয়ে মুসার দিকে ফিরে হাত নাড়ল একবার।

বালিয়াড়ির দিকে হাঁটতে থাকল মুসা। চিন্তায় ভারী হয়ে আছে মন। সামনে কতগুলো ছেলেমেয়েকে জটলা করতে দেখে আর সেদিকে এগোল না। ঘুরে গেল পাহাড়টার দিকে। রাতের পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে বিশাল একটা স্তম্ভের মত লাগছে পাথরের কালো চূড়াটা।

জিনার কথা ভাবল। সকালে হয়তো ওর মেজাজ খারাপ ছিল। সেজন্যে কোন কথা শুনতে চায়নি। আবার কি যাবে ওকে বোঝাতে?

নাহ্, যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। গিয়ে কোন লাভ নেই। ওর কথা শুনবে না জিনা।

কিন্তু ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই হবে। জন যে ভ্যাম্পায়ার এ বিশ্বাসটা মনে বদ্ধমূল হচ্ছে ক্রমেই। ওর খপ্পর থেকে জিনাকে সরিয়ে আনতে না পারলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবে জিনা।

আনমনে ভাবতে ভাবতে পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চলল সে। চিন্তায় ডুবে না থাকলে আরও আগে দেখতে পেত। চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়াল। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে।

একটা উঁচু বালির ঢিবিতে পড়ে আছে কালোমত কি যেন। নিথর।

খাইছে! কি ওটা? আবার লাশ!

এগারো

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে নিচু, ছায়ায় ঢাকা বালিয়াড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ঘুরে দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। জিনিসটা কি দেখার কৌতূহলও দমন করতে

পারছে না।

ভয় আর কৌতূহলের লড়াই চলল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। কৌতূহলের জয় হলো। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল সে। কাছে পৌঁছে দেখল মানুষই, তবে মৃত নয়। কালো আঁটসাঁট পোশাক পরা মেয়েটা বসে আছে বালিয়াড়ির ওপর, দুই পা জড় করে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে।

'লীলা!' ডাকল সে।

জবাব দিল না মেয়েটা।

'লীলা?' জোরে ডাক দিয়ে আরেক পা আগে বাড়ল মুসা। ভয় কাটেনি এখনও। পা কাঁপছে।

তবু সাড়া দিল না মেয়েটা।

বালিয়াড়ির একেবারে কাছে এসে আবার ডাক দিল মুসা, 'এই, লীলা!'

অবশেষে মুখ তুলল লীলা। আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে তার গালের পানি। কাঁদছিল।

'সরি,' এক পা পিছিয়ে গেল মুসা। বিব্রতকর অবস্থা। কি করে সামাল দেবে বুঝতে পারছে না। আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আবার বলল, 'সরি!'

ওর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার চোখ মিটমিট করল লীলা। চিনতে অনেক সময় লাগল। দ্বিধান্বিত মনে হলো ওকে। যেন নিজের গভীর বেদনা, গভীর ভাবনায় হারিয়ে ছিল, বাইরের কারও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

হাসল। জোর করে দুই হাত তুলে ডলে ডলে মুছল চোখের পানি। গালের পানি মুছল।

'ও, তুমি!···চিনতে পারিনি,' থেমে থেমে বলল লীলা। নিজের হাত দুটো তুলে রেখেছে মুসা। ওগুলোকে নিয়ে কি করবে, যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। অবশেষে দুই পাশে ঝুলিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীলা। 'জানি না। খালি কান্না পাচ্ছে।'

'রিকির জন্যে?' বলেই থমকে গেল। প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না তো! 'মানে, আমি বলতে চাইছি···'

'রিকির জন্যেই,' লীলা বলল। 'সৈকতে, শহরে, যেখানেই যাই, মনে হয় এই বুঝি সামনে পড়ল রিকি। এই বুঝি ডেকে উঠল "হাই" করে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ও নেই। ওর এ ধরনের কিছু ঘটবে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। কাউকে এ ভাবে মরতে দেখিনি তো। লাশই দেখিনি কখনও।'

'বুঝতে পারছি,' লীলার দিক থেকে আস্তে করে পানির দিকে মুখ ফেরাল মুসা। 'আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না। খুব খারাপ লাগছে আমারও। ও আমার বন্ধু ছিল।'

জবাব দিল না লীলা। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল। কাপড়ে লেগে যাওয়া বালি ঝাড়ল। ধীর পায়ে নেমে এসে দাঁড়াল মুসার সামনে। এত কাছে, ওর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল মুসার মুখে।

'বন্ধু হিসেবে ও যে কি ছিল তোমার কাছে, সে তো বুঝতেই পারছি। আমার সঙ্গে মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তাতেই যে কষ্টটা লাগছে,' আবার

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল লীলার। গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। 'সহ্য করতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, ও খুব ভাল মানুষ ছিল,' লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না মুসা। সম্মোহন করে ফেলা হচ্ছে যেন তাকে।

চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে বইছে সাগরের হাওয়া।

হাত তুলল লীলা। এলোমেলো চুল সরাল মুখের ওপর থেকে। একটু বেশিক্ষণই হাতটা উঠে রইল ওর আর মুসার মুখের মাঝখানে। একটা মিষ্টি গন্ধ ঢুকল মুসার নাকে। কিসের বুঝতে পারল না সে। পারফিউমের গন্ধই হবে হয়তো।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল মুসার। এমন লাগছে কেন? আগের রাতে ভাল ঘুম হয়নি। সারাদিনে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেছে। হয়তো সেজন্যেই খারাপ লাগছে।

'কাল রাতে কেন যে সাঁতার কাটতে নেমেছিল রিকি বুঝলাম না,' জোর করে লীলার চোখ থেকে চোখ সরাল মুসা।

'আমিও না।'

'ও কিন্তু খুব শান্তশিষ্ট ছিল,' মাথার ঘোর লাগা ভাবটা ঝাড়া দিয়ে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল মুসা। 'রাত দুপুরে হঠাৎ এরকম একটা কাণ্ড করার মত স্বভাব ছিল না।'

'সেটা ওর সঙ্গে কয়েকদিনের পরিচয়েই বুঝেছিলাম,' মুসার মাথা ছাড়িয়ে বহুদূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল লীলা। নির্জন সৈকতটা দেখছে। 'অবাক লেগেছে সেজন্যেই। কাল রাতে আমাকে কটেজে পৌঁছে দিয়ে যখন বলল সে স্কিনডাইভ করতে যাচ্ছে, বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি ভেবেছি বাড়ি ফিরে যাবে।'

'অবাক কাণ্ড!' মাথা ঘুরছে মুসার।

'সকালে যখন শুনলাম খবরটা···' কথা আটকে গেল লীলার। শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখল মুসা। কেঁপে উঠল লীলা। কয়েকটা সেকেন্ড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মুখ তুলে তাকাল। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'সরি!···কি করব? কিছুতেই থামাতে পারছি না। ঘটনাটার পর তোমাকেই প্রথম পেলাম, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারছি।'

মুসার হাতটা ধরল সে। আরও এগিয়ে এল।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা।

ওর গলার দিকে তাকাচ্ছে লীলা। চোখে চোখ রাখল মুসার।

মুসার অস্বস্তি বাড়ছে। সরে যাওয়ার কথা ভাবছে।

সেটা বুঝতে পারল বোধহয় লীলা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল। দ্বিধা করছে। কোন একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যেন। আচমকা হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। কোন কথা না বলে ঘুরে লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়াতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে।

কি ভেবে মুসাও পিছু নিল তার।

বারো

সেরাতেও রিকিকে স্বপ্ন দেখল মুসা। তাকে সাবধান করে দিতে এসেছিল রিকি। কি করে মারা গেছে, ইনিয়ে-বিনিয়ে জানাল। রক্ত শুষে খেয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে সাগরে ফেলে দিয়েছে। গলার ফুটো দুটো দেখাল। ভ্যাম্পায়ারের কাছ থেকে সাবধান থাকতে বলল।

রিকি মিলিয়ে যেতেই একদল ভ্যাম্পায়ারকে আসতে দেখল মুসা। তাড়া করল ওকে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে আর কোন উপায় না দেখে শেষে সাগরে ঝাঁপ দিল সে। টান দিয়ে মাঝসাগরে ভাসিয়ে নিল ওকে স্রোত। প্রচণ্ড ঢেউ ঝাঁকাতে শুরু করল। বহুদূর থেকে ডাক শোনা যেতে লাগল, 'এই মুসা, মুসা!'

ঘুম ভেঙে গেল মুসার। দেখে ঢেউয়ে নয়, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিচ্ছেন তার বাবা। 'কি ব্যাপার? ওঠো। আজ এত দেরি কেন?'

'অনেক রাতে শুয়েছি,' চোখ ডলতে ডলতে জবাব দিল মুসা। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন বাবা। সোনালি রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে।

'দশটা তো বাজে,' টেবিল-ঘড়িটার দিকে হাত তুললেন মিস্টার আমান। 'ওঠো। আমরা সব কাপড়-চোপড় পরে রেডি। জলদি উঠে কাপড় পরে নাও। পিয়ারে যাওয়ার সময় নাস্তা খেয়ে নিয়ো।'

'খাইছে!' ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে বিছানার বাইরে মেঝেতে পা রাখল মুসা। চোখের পাতা আধবোজা করে বাবার দিকে তাকাল, এখনও পুরোপুরি খুলতে পারছে না। 'কোথায় যেন যাওয়ার কথা আমাদের?'

'ভুলে গেছ? সমুদ্রে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার কথা না? ডক্টর বেনসনের বোটে করে?' ছেলের কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিলেন আমান। 'বসে আছ কেন? জলদি করো।'

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে রওনা হলেন তিনি।

'আমি পারব না, বাবা,' বলেই ধপ করে আবার বালিশের ওপর পড়ল মুসা।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন আমান। উদ্বেগ ফুটেছে চেহারায়। 'কি ব্যাপার? শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ,' বলেই তাড়াতাড়ি শুধরে নিল মুসা, 'না।···জানি না। বুঝতে পারছি না।'

'হয়েছে কি তোমার?' দু'পা এগিয়ে এলেন আমান। 'জ্বর-টর নাকি?'

'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে,' বালিশ থেকে মাথা তুলল না মুসা। 'অসুস্থ হইনি

এখনও। তবে মনে হয় হব। জীবাণু ঢুকে গেছে।'

'মুখটাও তো কেমন সাদা সাদা লাগছে। বোটে করে খোলা সাগরে ঘুরে এলে ঠিক হয়ে যাবে। চলো। ওঠো।'

'না বাবা, আমি পারব না। তোমরা যাও। আমি শুয়ে থাকি। ঘুমিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমান। ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। সত্যি যাবে না?'

'না। ডক্টর বেনসনকে বোলো, আমার জন্যেই দেরি হয়ে গেছে তোমাদের। তিনি কিছু মনে করবেন না।'

আনমনে মাথা ঝাঁকালেন আমান। আরেকবার দ্বিধা করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আবার এগোলেন দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরলেন। 'এখনও ভেবে দেখো। পরে কিন্তু পস্তাবে। ছিপ দিয়ে বড় মাছ ধরার সুযোগ সব সময় আসে না।'

'পস্তালেও কিছু করার নেই, বাবা। আমি জোর পাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই যেন বেরিয়ে গেলেন আমান। কয়েক মিনিট পর সদর দরজা লাগানোর শব্দ কানে এল মুসার। আরও কয়েক মিনিট পর গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ।

কিছুক্ষণ একভাবে পড়ে থাকার পর আস্তে মাথাটা সোজা করল মুসা। ভীষণ ভারী লাগছে। গতরাতের কথা মনে পড়ল। লীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটা বিচিত্র গন্ধ ঢুকেছিল নাকে। বোঁ করে উঠেছিল মাথাটা। তারপর থেকে আর সুস্থ বোধ করেনি।

আরও মনে পড়ল, লীলা পাহাড়ের দিকে চলে গেলে সে-ও পেছন পেছন গিয়েছিল। ও কোথায় যায় দেখার জন্যে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর এমনই মাথা ঘোরা শুরু হলো, হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়েই থাকতে পারছিল না আর। বসে পড়েছিল। তারপর আর মনে নেই। এক সময় দেখে, বালির ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। ওপরে খোলা আকাশ। আশেপাশে একদম নির্জন। লীলাও ছিল না। উঠে টলতে টলতে কোনমতে বাড়ি ফিরে এসেছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে চলল। মাথা ঘুরছে। পেটে মোচড় দিচ্ছে। আগের রাতের মত বেহুঁশ হয়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

বাথরুমে ঢুকে সিঙ্কের ওপর মুখ নামাল। হড়হড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল পেটে যা ছিল।

ওয়াক ওয়াক আর হেঁচকি দিতে দিতে পেট ব্যথা হয়ে গেল, গলা চিরে গেল। পেটে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। মনে হচ্ছে নাড়ীভুঁড়ি সব গিট বেঁধে গেছে। ঝনঝন করে মাথা ঘুরছে। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম। বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে পড়ল সে।

কয়েক মিনিট পর গিট বাঁধা অবস্থাটা সামান্য কমল। চোখের সামনে বাথরুমের দেয়াল ঘোরাও বন্ধ হয়েছে।

সচকিত হলো সে। নষ্ট করার মত আর সময় নেই!

জিনাকে সাবধান করতে হবে। বোঝাতেই হবে ওকে কি মস্ত বিপদে পড়েছে সে। জনের কথা বলতে হবে।

হঠাৎ কি মনে হতে তাড়াতাড়ি উঠে বেসিনের আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের গলায় দেখল দাগ আছে কিনা।

নেই!

আহ্, বাঁচল! কিন্তু তাহলে মাথা ঘুরল কেন? বেহুঁশ হলো কেন? মিষ্টি গন্ধটার কথা মনে পড়ল। এরকম গন্ধ ছড়িয়েই কি মানুষকে মাতাল করে ভ্যাম্পায়ার ভূত? অবশ করে দেয় শরীর? যাতে নিরাপদে রক্ত পান করতে পারে?

তারমানে সে বেঁচে গেছে কোনভাবে। হয়তো চলে যাওয়ার পর কোন কারণে আর ফিরে আসেনি লীলা। রক্ত খায়নি। তাহলে গলায় দাঁতের দাগ থাকতই।

দাঁত ব্রাশ করল সে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিল। একটা বেদিং স্যুট পরে নিল তাড়াতাড়ি। হাত-পা কাঁপছে এখনও। তবে ভ্যাম্পায়ারে রক্ত খেয়ে কাহিল করে রেখে যাওয়ার ভয়টা কেটেছে।

রান্নাঘরে নেমে এল সে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে জিনাদের নম্বরে ফোন করল। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রিঙ হচ্ছে। একবার। দুবার।

রিঙ হয়েই চলেছে।

ধরল না। তারমানে কেউ বাড়ি নেই।

'জিনা, প্লীজ!' চিৎকার করে অনুরোধ করল সে। 'ধরো! কথা আছে তোমার সঙ্গে!'

কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কানে রিসিভার ঠেকানো। ওপাশে বেজেই চলেছে ফোন।

'জিনা, প্লীজ!'

কিন্তু কেউ ধরল না তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে।

তেরো

দ্রুত নাস্তা সেরে নিয়ে আবার জিনাদের বাড়িতে ফোন করল মুসা। জবাব পেল না।

অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে শরীরে। জিনাকে শহরে খুঁজতে চলল সে।

খুব গরম একটা দিন। নব্বইয়ের ঘরে তাপমাত্রা। এই অঞ্চলের জন্যে গরমটা বেশি। শহরে আসতে আসতেই ক্লান্ত হয়ে গেল মুসা। মেইন স্ট্রীটের আশপাশে সব জায়গায় খুঁজে কোথাও না পেয়ে সৈকতে রওনা হলো।

ওখানেও পাওয়া গেল না তাকে।

বাড়িতে ফিরে এসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল কাউচে শুয়ে। কয়েক মিনিট

পর পরই উঠে জিনাদের বাড়িতে ফোন করল। রিঙের পর রিঙ হতে থাকল, কিন্তু কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ ধরল না ফোন।

বিকেলে আবার শহরে গেল সে। জিনাকে খোঁজার জন্যে।

'আই, মুসা,' সী-ব্রিজ রোড ধরে যাওয়ার সময় কানে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল সে।

প্রায় দৌড়ে এল টনি। 'তারপর, কি খবর?'

'ভাল,' গতি না কমিয়েই জবাব দিল মুসা।

গাছের আড়ালে নেমে যাচ্ছে সূর্য। কিন্তু গরম এখনও বেশ। বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি। চামড়া চুলকাচ্ছে মুসার। শরীরটা লাগছে বিশ মন ওজন।

'সৈকতে খুঁজে এলাম তোমাকে,' মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে টনি। 'যা গরম পড়েছে, ভাবলাম ওখানেই থাকবে। এখানে আশা করিনি।'

'তুমিও এখানে থাকবে ভাবিনি,' শুকনো গলায় মুসা বলল। 'আর্কেডের এয়ারকন্ডিশনের ঠাণ্ডা ফেলে সৈকতে গেলে কি বুঝে?'

'যেতাম না,' হাসতে হাসতে বলল টনি। 'কি যেন খারাপ হয়ে গেছে ওদের। মেরামত করছে।'

'টনি, আমার শরীরটা ভাল নেই,' আগের রাতের পুরো ঘটনাটা বলল না মুসা। বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সময় নষ্ট না করে জিনাকে খুঁজে বের করতে হবে। কি ঘোর বিপদে রয়েছে সে, বোঝানো দরকার। টনির সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই এখন ভাল ছিল।

'হ্যাঁ, তোমাকে দেখে অসুস্থই লাগছে।'

'কি রকম?'

'মুখ শুকনো। বিধ্বস্ত।' আড়চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসি হাসল, 'ভ্যাম্পায়ার নাকি?'

দাঁড়িয়ে গেল মুসা, 'কি বলতে চাও?'

'মানে, কাল যে বললে—অন্য ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি? কি যেন নাম, লীলা—তোমার রক্তও খেয়েছে নাকি?'

'না। এমনিতেই শরীর খারাপ। জ্বরটর হবে। ভাইরাস।'

হাসিটা মুছে গেল টনির মুখ থেকে। 'মিথ্যে বলছ কেন, মুসা? সত্যি সত্যি বলো তো, কি হয়েছে তোমার?'

জবাব না দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল মুসা।

পিছে পিছে চলল টনি। শেষ হয়ে এল কটেজের সারি। সামনে ঘাসে ঢাকা মাঠ, যেটার ওপাশে শহর। দিনের আলো নিভে আসছে দ্রুত। যেন হারিকেনের চাবির মত চাবি ঘুরিয়ে ক্রমে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে আলোটা। দিগন্তে নেমে যাওয়া সূর্য বেগুনী আকাশে প্রচুর লাল রঙ গুলে দিয়েছে।

'রাতে কার্নিভলে যাবে?' জিজ্ঞেস করল টনি। 'আমার কয়েকজন বন্ধু প্রথমে যাবে আর্কেডে। অন্ধকার হয়ে গেলে তখন যাবে কার্নিভলে।'

'দেখি,' কোন আগ্রহ দেখাল না মুসা। জিনাকে চোখে পড়তে চিৎকার করে উঠল, 'আই, জিনা!'

কয়েক গজ সামনে মাথা নিচু করে হাঁটছে জিনা। যেন কোন জিনিস খুঁজতে খুঁজতে চলেছে রাস্তায়।

'জিনা!' গলা আরও চড়িয়ে দিয়ে ডাকল মুসা।

মুসার মনোযোগ এখন ওর দিকে নেই বুঝে, 'পরে দেখা হবে' বলে এগিয়ে গেল টনি। জিনার পাশ কাটানোর সময়, 'কেমন আছ, জিনা?' বলে জবাবের অপেক্ষা না করেই হেঁটে চলে গেল।

মুসাও দৌড়ে গেল জিনার দিকে। 'এই, জিনা, শোনো!'

থামল জিনা। মুখ তুলে তাকাল। হাসি নেই মুখে। গম্ভীর। 'অ। তুমি।'

বড়ই শীতল আচরণ। কেয়ারও করল না মুসা। ওসব দেখার সময় নেই এখন। জিনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বোঝাতে হবে কি ঘটছে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল জিনা। ম্লান আলোতেও ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। চোখে ক্লান্তির ছাপ। গলার দাগ দুটো দেখা যাচ্ছে।

'কথা আছে তোমার সঙ্গে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমি সকাল থেকেই...'

হাত নেড়ে মুসার কথা যেন ঝেড়ে ফেলে দিল জিনা। 'আমার সময় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে জনের সঙ্গে দেখা করার কথা...'

'ওর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে,' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'নিজেকে দেখেছ আয়নায়? গলার দাগ দুটো দেখেছ?'

'দেখো, মুসা,' মুহূর্তে রাগ চড়ে গেল জিনার। 'আবার সেই এক প্যাচাল শুরু কোরো না,' মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

'এক মিনিট, জিনা,' অনুরোধের সুরে বলল মুসা। হাত রাখল জিনার কাঁধে। 'মাত্র একটা মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চিন্তা করল জিনা। 'বেশ, ঠিক এক মিনিট। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কথা যদি বলতে চাও, শুনব না।'

'জিনা, আমি ভ্যাম্পায়ারের কথাই বলতে চাই,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা। নিজের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 'জন একটা ভ্যাম্পায়ার। আমি জেনে গেছি। লীলাও তাই। ওরা দুজনেই ভ্যাম্পায়ার।'

'গুড-বাই, মুসা,' শীতল কণ্ঠে বলল জিনা। চোখ ওপরে তুলে, দুই হাত নেড়ে মুসাকে বিদেয় হতে ইঙ্গিত করল।

'জিনা, শোনো! প্লীজ!'

'না! শুনব না!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'যাও তুমি!'

'কাল রাতে রিকি আমাকে বলেছে...'

ঝটকা দিয়ে মুসার দিকে মুখ ফেরাল জিনা, 'কি বললে!'

'কাল রাতে, রিকি আমাকে বলল...'

'কোথায় দেখা হলো ওর সঙ্গে!'

'স্বপ্নে।'

'মুসা, তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার,' অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেল জিনার কণ্ঠ। সহানুভূতির সুর। 'রিকির জন্যে আমাদের সবারই কষ্ট···কিন্তু তোমার বেলায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে···তোমার মগজে কিছু ঘটে গেছে। তোমার চিকিৎসা দরকার।'

'না, আমার কোন কিছুর দরকার নেই,' হতাশা চাপা দিতে পারল না মুসা। 'আমি জানি আমি ঠিক আছি, জিনা। আমার কথা শুনলে পাগলামিই মনে হবে···'

'হ্যাঁ, পাগলই হয়ে গেছ তুমি,' মুসার চোখে চোখ রেখে বলল জিনা। 'সেটা নিজে তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমি জানি আমি পাগল হইনি! দয়া করে আমার কথা কি একটু শুনবে?'

'এখন পারব না। আমি এখন একটা জিনিস খুঁজছি।'

'কি জিনিস খুঁজছ?'

মাথা নিচু করে আবার হাঁটতে শুরু করল জিনা। মনে হলো কিছু হারিয়েছে রাস্তায়। স্যান্ডেলের ঘষায় খসখস শব্দ হচ্ছে। চঞ্চল হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে চোখ জোড়া। মুসার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, 'একটা রূপার ক্রুশ। কাল রাতে জনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তখন কোনভাবে গলা থেকে পড়ে গেছে ওটা।'

'ক্রুশ! তোমার গলায় ক্রুশ!' তাজ্জব হয়ে গেল মুসা। 'তুমি আবার ধর্ম পালন শুরু করলে কবে থেকে? গির্জায় যাও?'

'ধর্ম পালন না করলে কি ক্রুশ গলায় পরা যায় না? গত জন্মদিনে আমার এক নানা দিয়েছিলেন। আসলে ওটা একটা লকেট। ক্রুশের মত করে তৈরি। মাঝখানে একটা পাথর বসানো।'

'তোমার নানা কি পাদ্রী নাকি?'

'কি করে বুঝলে?'

'নাতনীকে ক্রুশের মত লকেট উপহার দেন যিনি, তিনি ওরকমই কিছু হবেন, এটা আন্দাজ করতে জ্যোতিষ হওয়া লাগে না। কিন্তু কাল পরতে গিয়েছিলে কেন?'

'মা সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করছিল। ওটা দেখে হঠাৎ পরতে ইচ্ছে করল। নিয়ে নিলাম। হারিয়ে ফেলব কল্পনাই করিনি। খুঁজে এখন বের করতেই হবে। নইলে খুব কষ্ট পাবে মা। রেগে যাবে।'

রূপার ক্রুশ! অন্ধকারে যেন আশার আলো দেখতে পেল মুসা। শুনেছে, ভ্যাম্পায়ারেরা নাকি ক্রুশকে ভয় করে। ভ্যাম্পায়ারেরা তো যমের মত ভয় করে।

'জন দেখেছে নাকি ওটা?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা। 'দেখে কি করল? তোমার গলায় দেখে সরে গেল না? ফেলে দিতে বলল না? কুঁকড়ে গিয়েছিল?'

জবাব দিল না জিনা।

ওর সামনে এসে দাঁড়াল মুসা। মুখ দেখে অনুমানের চেষ্টা করল, জন কি করেছিল।

'এ রকম পাগলের মত করছ কেন তুমি, বলো তো?' ভুরু কুঁচকে

ফেলেছে জিনা। 'সত্যি কথাটা শুনবে? ক্রুশটা ওকে দেখিয়েছি। ও পছন্দ করেছে।'

'চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি?'

'না। মোটেও ভয় পায়নি। বরং চেনের হুক একবার খুলে গিয়েছিল। সে ওটা আটকে দিতে সাহায্য করেছে আমাকে।'

পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দুজনে। তারপর রুক্ষকণ্ঠে জিনা বলল, 'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল তোমার ধারণা ভুল।'

'না, কিছুই প্রমাণ হলো না,' নাছোড়বান্দার মত জিনার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল মুসা। ভিন্নভাবে জিনাকে বোঝানোর চেষ্টা চালাল, 'এখনও তোমার ক্লান্ত লাগে? সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়?'

'তোমার ওই বোকার মত প্রশ্নের কোন জবাব আর আমি দেব না,' মুসার দিকে ফিরেও তাকাল না জিনা।

হাল ছাড়ল না মুসা, 'দিনের বেলা কখনও দেখা হয়েছে জনের সঙ্গে? দেখা না করার ছুতো দেখায়নি–বলেনি দিনে জরুরী কাজ থাকে বলে আসতে পারে না? ও যেখানে কাজ করে সে-জায়গাটা চেনো? একবারও তোমার মনে হয়নি সেরাতে আমরা যখন পিজ্জা খাচ্ছিলাম, কেন সে মুখে তুলতেও রাজি হয়নি?'

রাগে ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জিনা। মুঠো হয়ে গেছে দুই হাত। 'মুসা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও, জিনা!'

'তুমি এখন বিদেয় হলে আমি খুশি হব।'

'না, বিদেয় হব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা শুনছ, আমি যাব না।'

'মুসা, দোহাই লাগে তোমার!' চিৎকার করে উঠল জিনা, 'যাও এখন! বিরক্ত কোরো না! আমার অসহ্য লাগছে!'

গেল না মুসা। বরং জিনাকে শান্ত করার জন্যে ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল।

ঝটকা দিয়ে সরে গেল জিনা।

জনের আগমনটা টেরই পায়নি মুসা। এখন দেখল, নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'খাইছে!'

জনের পরনে কালো জিনস, গায়ে লম্বা হাতাওয়ালা কালো পুলওভার। এত গরমের মধ্যে এই পোশাক পরে না সাধারণত কেউ।

'কি হয়েছে?' মুসার দিকে তেড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল সে।

ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপনি শুরু হলো মুসার। পেটে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূত। ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল হাত-পা।

'না, কিছু হয়নি,' জিনা বলল।

এক পা পিছিয়ে এল মুসা। দুহাত ঝুলে পড়েছে দুই পাশে। জনের চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন গরম লোহার চোখা শিকের মত ঢুকে যাচ্ছে তার মগজের মধ্যে।

'বললাম তো কিছু হয়নি,' জন যে রেগে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল জিনা। 'এমনি কথা বলছিলাম আমরা।'

জিনার দিকে ফিরল জন। মুহূর্তে বদলে গেল মুখের ভঙ্গি। হাসল। 'সেই "এমনি" কথাটা আমাকে নিয়েই হচ্ছিল। মুসাকে আমার নাম বলতে শুনলাম।'

'হ্যাঁ, ভুল শোনোনি,' জনের হাত ধরল জিনা। টান দিল।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দুজনে। চলে যাচ্ছে।

কিছুই করার নেই আর মুসার। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। জনের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন এখনও বিদ্ধ করছে ওকে।

চলতে চলতে একবার ফিরে তাকাল জিনা। মুসা এখনও পেছন পেছন আসছে কিনা দেখল বোধহয়। জন একটিবারের জন্যেও ফিরল না।

ঠিকই সন্দেহ করেছি আমি! নিজেকে বলল মুসা। আমার ধারণাই ঠিক! পথের মোড়ে দুজনকে হারিয়ে যেতে দেখল।

কিন্তু কি করে প্রমাণ করবে জিনার কাছে? কিশোরকে খবর দেবে? যদি ওকে না পাওয়া যায়? পাওয়া গেলেও আসতে যদি দেরি করে ফেলে? বাঁচানো যাবে না জিনাকে।

বাঁচাতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার।

কি করবে? কি করে বোঝাবে ওকে?

উপায়টা বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ! নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে জিনা।

চোদ্দ

'ক্যামেরা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?' লিভিং রুম থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার আমান।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'ও, বাবা, তুমি। দেখিইনি।' খাপে ভরা ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল আবার। 'কখন এলে?'

'এই তো। কিসের ছবি তুলতে যাচ্ছ?'

'রাতে সৈকতে অনেক পাখি পড়ে,' মিথ্যে কথা বলল মুসা। ভ্যাম্পায়ারের কথা বললে বাবাও হয়তো বিশ্বাস করবেন না। একশো একটা কথা বলা লাগবে [illegible]। আর সময় নেই। 'দেখি, কোনটা পাই নাকি?'

হাতের পত্রিকাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন আমান। 'পাখি? রাতের বেলা? কি পাখি? সী-গাল ছাড়া আর তো কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'ওগুলোই তুলব। নানা রকম কাণ্ড করে রাতের বেলা। এমন ভাবে তাড়া করে বেড়ায় একে অন্যকে...'

'কিন্তু তার জন্যে তো মুভি ক্যামেরা দরকার। স্টিল ফটোগ্রাফে কি আর ধরা যাবে নাকি?'

'মুভি আর পাব কোথায় এখন। স্টিলই তুলব,' বাবার সঙ্গে মিথ্যে বলতে খারাপ লাগছে মুসার। কিন্তু সত্যি বলার আপাতত কোন পথও দেখতে পাচ্ছে না। জিনাকে বিশ্বাস করাতে পারেনি, টনিকে পারেনি, বাবাকেও পারবে বলে মনে হয় না। বিশ্বাস না করে যদি মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে ভেবে ওকে আটকে দিতে চান, জিনার মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। এতবড় ঝুঁকি এখন কিছুতেই নিতে পারবে না সে।

'ঠিক আছে, যা পারো তোলোগে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এটা ব্যবহার করার কিছু নিয়ম আছে, নইলে ছবি ভাল ওঠে না। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি,' পত্রিকা রেখে উঠে এলেন আমান। 'রাতের বেলা এটা দিয়ে ছবি তুলতে গেলে ফোকাসিঙের দিকে নজর রাখতে হয়। দেখি, দাও, ঠিক করে দিই।'

কার্নিভলে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ হবে বাবার। যা করতে চাইছে করুক। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

খাপ থেকে ক্যামেরাটা খুলে নিলেন আমান। কিভাবে সবচেয়ে ভাল ফোকাসিং হবে দেখিয়ে দিলেন। চোখের সামনে কোন্‌ভাবে ধরে কিভাবে শাটার টিপতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন।

বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে 'গুড-নাইট' বলে বেরিয়ে এল মুসা।

কার্নিভলে গিয়ে পুরো এক রোল ফিল্ম জিনা আর জনের ওপর খরচ করার ইচ্ছে ওর। ও শুনেছে, ভূতের ছবি ওঠে না। প্রতিটি ছবিতেই যখন জিনা দেখবে ওর একলার ছবি আছে, আশেপাশের সব কিছুর ছবি আছে, কেবল জনের নেই, তখন মুসার কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। জনকে ভ্যাম্পায়ার প্রমাণ করার এটাই একমাত্র পথ।

অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক হেঁটে কার্নিভলে এসে পৌঁছল সে। শক্তিশালী স্পটলাইটের আলোর নিচে এসে দাঁড়াল। আশপাশের সমস্ত জায়গায় জিনা আর জনকে খুঁজতে লাগল ওর চোখ। চতুর্দিক থেকে কানে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল, হাসির শব্দ। হঠাৎ মনে পড়ল লীলার কথা। ও কোথায় এখন? সৈকতে? নতুন কোন শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করছে?

লীলার কথা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে জিনাদের খুঁজতে লাগল সে। দুই হাতে ধরে রেখেছে ক্যামেরাটা। যেখানে যে অবস্থায় দেখবে ওদের, সেভাবেই তুলে ফেলবে। ফেরিস হুইলটার কাছে এল। জনতার ভিড়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ওদের মধ্যে খুঁজল জিনা আর জনকে। হুইলে চড়ার জন্যে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল একদল ছেলেমেয়ে। ধাক্কা মারল মুসার গায়ে।

কাত হয়ে পড়তে পড়তে এক হাতে ক্যামেরা ধরে রেখে আরেক হাতে একটা খুঁটি আঁকড়ে পতন ঠেকাল মুসা। অল্পের জন্যে মাটিতে পড়ল না ক্যামেরাটা। বিড়বিড় করে বলল, 'উফ, পাগল হয়ে গেছে একেবারে!' ক্যামেরা এভাবে হাতে রাখার সাহস পেল না আর। যে রকম উত্তেজিত হয়ে

আছে ছেলেমেয়েগুলো, কখন কি ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই। খাপে ভরল আবার। তবে ঢাকনাটা না লাগিয়ে খোলাই রাখল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেল জিনা আর জনকে। ফেরিস হুইলটা থেকে একটু দূরে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে।

তাড়াতাড়ি ক্যামেরা খুলে আনতে গিয়ে খাপের ফিতে হাতে পেঁচিয়ে ফেলল মুসা। উত্তেজনায় কাঁপছে। পাশ থেকে খাপটা চলে এল পেটের ওপর। গলার ফিতেতে টান লাগল। কোনমতে বের করে আনল ক্যামেরাটা।

সবে শাটারে টিপ দিচ্ছে, ক্যামেরার চোখ আটকে দিয়ে সামনে চলে এল একটা মেয়ে। শেষ মুহূর্তে মুসার দিকে তাকিয়ে 'সরি' বলল। দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। শাটার টিপে ফেলেছে মুসা। প্রথম ছবিটা নষ্ট হলো।

দ্বিতীয়বার সুযোগ নেয়ার আগেই কয়েক গজ দূরে সরে গেল জিনারা। একটা রিফ্রেশমেন্ট বূদের কাছে গিয়ে সুযোগ মিলল আবার। কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল মুসা। ক্যামেরা তুলে শাটার টিপল। তারপর টিপেই চলল, একের পর এক।

ফোকাস ঠিক করে আরও কাছে থেকে তোলার জন্যে এগিয়ে এল সে। আলো ঠিক আছে নাকি দেখল। তারপর আবার জিনা আর জনকে ফ্রেমে আটকে শাটার টিপতে লাগল।

মুখ তুলল জিনা।

ঝট করে বূদের আড়ালে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা।

দেখে ফেলল নাকি?

আস্তে করে মাথাটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে দেয়ালের ওপরে তুলে সাবধানে উঁকি দিল।

না, দেখেনি। জনের দিকে ফিরেছে আবার জিনা। কথা বলছে।

আরও সতর্ক হয়ে গেল মুসা। কোনমতেই জনের চোখে পড়া চলবে না। জন দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে মুসার উদ্দেশ্য। তারপর কি যে ঘটাবে খোদাই জানে! ভ্যাম্পায়ারদের ভয়ানক ক্ষমতার কথা কল্পনা করে এত লোকজন আর আলোর মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল ওর।

দুজনের পেছনে লেগেই রইল সে। ছবি যা তোলা হয়েছে, তাতেই কাজ হয়ে যাবে, তবু আরও ভাল ছবি তোলার অপেক্ষায় রইল সে। পিছে পিছে ঘুরতে লাগল ওদের।

ফেরিস হুইলে চড়ল দুজনে। মেটাল কারে পাশাপাশি বসল, খুব কাছাকাছি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে।

জুম লেন্স অ্যাডজাস্ট করে ক্যামেরার চোখ দুজনের দিকে তুলে শাটার টিপে দিল মুসা।

নিশ্চয় ছবিটা ভাল উঠেছে। কিন্তু থামল না মুসা। পুরো একটা রোলই শেষ করবে। কোন খুঁত রাখতে চায় না। বেশি ছবি হলে জিনাকে বিশ্বাস করানো সহজ হবে।

ফেরিস হুইল থেকে নামার পরও ওদের পিছে লেগে রইল সে। গেম

বূদগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছে দুজনে। চওড়া গলিপথের অন্যপাশে বূদের আড়ালে থেকে ওদের অনুসরণ করে চলল সে। সুযোগ পেলেই ক্যামেরা তুলে শাটার টেপে।

ফিল্মে অল্প কয়েকটা শট বাকি থাকতে গলি থেকে বেরিয়ে এল।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে তাকাল জিনা। মুসাকে দেখে ফেলল। না চেনার ভান করল। জনের একটা হাত তুলে নিয়ে চোখ ফেরাল অন্য দিকে।

জিনা কিছু বলল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বলল না বলেই জনের চোখে পড়ল না।

বেশিক্ষণ আর থাকবে না দুজনের এই খাতির। জন ভ্যাম্পায়ার–এটা বোঝার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে জিনার, কি করবে, কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

আর ওদের অলক্ষে ছবি তোলা যাবে না। দরকারও নেই। অনেক তুলেছে। ক্যামেরাটা খাপে ভরল মুসা।

আসল কাজ হয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ছবিগুলো ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে।

খাপটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরে দৌড় দিল সে। না ধরলে বাড়ি লাগে। কার্নিভলের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, এই সময় ওর নাম ধরে ডাকল কে যেন। টনিই হবে।

কিন্তু থামল না মুসা। ফিরেও তাকাল না।

সারি সারি গাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার্কিং লটটা প্রায় দৌড়ে পেরোল সে। মেইন রোডে বেরিয়ে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। ফিল্ম ডেভেলপ করার দোকানটা রয়েছে এক ব্লক দূরে, ডিউন লেনের মোড়ে। বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন করে রেখেছে ওরা: এক ঘণ্টার মধ্যে ছবি দিয়ে দেয়া হয়।

ছবি পেতে এক ঘণ্টা! তারপর আর বড় জোর এক ঘণ্টা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জিনাকে বোঝাতে সক্ষম হবে সে, জন একটা ভ্যাম্পায়ার।

মেইন রোড পেরিয়ে অন্যপাশের ফুটপাথে উঠল মুসা। উত্তেজনায় ধাক্কা মেরে বসতে লাগল এর ওর গায়ে। পরোয়াই করল না। কনুইয়ের গুঁতোয় ভিড় সরিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলল। একটাই লক্ষ্য—ক্যামেরার দোকান।

মাঝবয়েসী এক লোক কোন্ আইসক্রীম খাচ্ছিল। মুসার ধাক্কা লেগে হাত থেকে পড়ে গেল আইসক্রীম। ছুটতে ছুটতেই 'সরি' বলল মুসা। লোকটার জবাব শোনার অপেক্ষা করল না। ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে চলেছে ডিউন লেনের দিকে।

কাছাকাছি পৌঁছে আবার রাস্তা পেরোতে হবে। ট্রাফিক লাইটের দিকে তাকাল না। দিল দৌড়। সামনে পড়ল নীল রঙের একটা স্টেশন ওয়াগন। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন বলল।

ফিরেও তাকাল না মুসা।

ওর কানে বাজছে কেবল 'এক ঘণ্টা'। এক ঘণ্টার মধ্যে হাতে এসে যাবে

ছবিগুলো। জন যে ভ্যাম্পায়ার, তার জোরাল প্রমাণ।

দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে দরজার নব চেপে ধরে টান দিল।

কিছুই ঘটল না। নব ঘুরল না। দরজাও খুলল না।

বন্ধ হয়ে গেছে দোকান। অন্ধকার। বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

পনেরো

পরদিন সকাল আটটায় ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মুসার। তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কথাটাই মনে পড়ল—ফিল্ম।

ডেভেলপ করতে হবে। জিনাকে দেখাতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

জিনাকে বাঁচাতে হবে।

কাপড় পরে, ঢকঢক করে এক গ্লাস কমলার রস খেয়ে, বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে চলল শহরের দিকে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। শক্ত করে ধরে রেখেছে ফিল্ম ভরা প্লাস্টিকের কৌটাটা।

রাতের বেলা কোন এক সময় সাগর থেকে ভেসে এসেছে কুয়াশা। ছড়িয়ে পড়েছে ডাঙার ওপর। তার মধ্যে দিয়ে ছুটছে মুসা। শহরের কিনারে যখন পৌঁছল, সামান্য হালকা হলো কুয়াশা। কিছু কিছু জায়গা থেকে সরেও গেল। তবে আকাশে মেঘ আছে। ধূসর, থমথমে হয়ে আছে। বাতাস ঠাণ্ডা। বাড়িঘরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা যেন আটকে রয়েছে।

মেইন রোডে উঠল সে। এত সকালে লোকজন নেই। স্যান্ডি হোলোর অন্যান্য দোকানপাটের মতই ছবি ডেভেলপের দোকানটাও দশটার আগে খোলে না।

কি আর করবে। সময় কাটানোর জন্যে নির্জন রাস্তার এমাথা ওমাথায় পায়চারি শুরু করল সে। হাতটা এখনও পকেটে। আঙুলগুলো ধরে রেখেছে কৌটাটা। যেন ছাড়লেই পকেট থেকে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাবে মূল্যবান সূত্রগুলো।

হাঁটার সময় দু'একজন মানুষ দেখা গেল। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত ওকে রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে দেখে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগল ওরা। ফিরেও তাকাল না সে। অন্য কোন দোকানের দিকে সামান্যতম আগ্রহ নেই। হাঁটছে আর কয়েক মিনিট পর পরই হাত চোখের সামনে তুলে এনে ঘড়ি দেখছে, দশটা বাজতে আর কত দেরি।

পায়চারি করার সময় বাড়িঘরের বেশি কাছে গেল না, বিশেষ করে

বিল্ডিঙের মাঝে মাঝে যেখানে কুয়াশা জমে রয়েছে। ভয় পাচ্ছে আবছা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ওর দামী সূত্রগুলো কেড়ে নেবে জন। যদিও জানে, ভয়টা একেবারেই অমূলক। বোকার মত ভাবনা। দিনের বেলা কোন কারণেই বেরোয় না ভ্যাম্পায়ার। বেরোতে পারে না। ওদের সে-ক্ষমতাই নেই।

কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে যখন মনে হলো মুসার, ঘড়িতে দেখে তখনও মাত্র সাড়ে নটা। একটা দুটো করে খাবারের দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে। অন্যান্য দোকানের চেয়ে খাবারের দোকানগুলো আগে খোলে। সী-ব্রিজ কফি শপের কাউন্টারের সামনে একটা টুলে এসে বসল সে। হালকা খাবার আর কফির অর্ডার দিল। পেট ভরানোর চেয়ে খাবার খেয়ে সময় কাটানোর দিকেই বেশি নজর তার। কেকের টুকরোটা চিবাতে গিয়ে করাতে কাটা কাঠের গুঁড়োর মত লাগল। কফিটা আরও বিস্বাদ। মগের কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল দুধ দিয়ে। কয়েক চামচ চিনি মেশাল। তারপরেও কোন স্বাদ পেল না। উত্তেজনায় জিভই নষ্ট হয়ে আছে, ভাবল সে। নইলে এত বিস্বাদ লাগতে পারে না কোন খাবার।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর বার বার চোখ যাচ্ছে কাউন্টারের পেছনে দেয়াল ঘড়িটার দিকে। অনড় হয়ে আছে যেন কাঁটাগুলো।

দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ছবি ডেভেলপের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দোকানের তরুণ ম্যানেজার তখন তালা খুলছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। তাকিয়ে থেকে ওর দোকান খোলা দেখতে দেখতে মনে মনে তাগাদা দিতে লাগল আরও তাড়াতাড়ি করার জন্যে। লোকটার লাল চুল শজারুর কাঁটার মত খাড়া। এক কানে পান্না বসানো একটা মাকড়ি।

দরজা খুলে লোকটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল মুসা।

ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে মুসাকে দেখতে দেখতে ম্যানেজার বলল, 'গুড মর্নিং। খুব তাড়া নাকি তোমার?'

পকেট থেকে কৌটাটা বের করে পুরু কাঁচ লাগানো কাউন্টারে রাখল মুসা। 'অতিরিক্ত তাড়া। একসেট করে দিন।'

কিন্তু ম্যানেজারের মধ্যে কোন তাড়া দেখা গেল না। পেপার ব্যাগ থেকে কফির একটা পাত্র বের করে ধীরে সুস্থে প্লাস্টিকের ঢাকনা খুলল। মুসার দিকে তাকাল। 'মেশিন খুলে রান করতে কিছুটা সময় লাগবে,' হাই তুলতে লাগল সে।

'এক ঘণ্টার মধ্যে পাব না?' জানতে চাইল মুসা।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'দেড় ঘণ্টা পর এসো। সাড়ে এগারোটার দিকে।' খাতা খুলে মুসার নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখতে শুরু করল সে। 'এক সেটই করাবে? এ হপ্তায় স্পেশ্যাল বোনাসের ব্যবস্থা করেছি আমরা। এর পর যত সেটই নাও, অর্ধেক দামে করে দেব।'

'থ্যাংক ইউ, লাগবে না,' মুসা বলল। 'এক সেটই যথেষ্ট। সাড়ে এগারোটায় আসব, না? হবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার। 'নিশ্চয় খুব সাংঘাতিক জিনিস তুলে এনেছ,' মুসার দিকে ঝুঁকে চোখ টিপল সে। 'দাম পাওয়া যাবে, এমন কিছু? আমার নিজের জন্যেও এক সেট করে রাখতাম তাহলে। ভয় নেই, বিনে পয়সায় রাখব না, কমিশন পাবে।'

'রাখলে রাখুনগে। কোন লাভ হবে না আপনার। আমাকেও পয়সা দেয়া লাগবে না। দয়া করে আমার ছবিগুলো আমাকে সময়মত দিয়ে দিলেই আমি খুশি।'

আবার মেইন স্ট্রীটে ফিরে এল মুসা। জিনাকে ফোন করা দরকার। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সাড়ে এগারোটায় সে কি করছে।

পে ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। না, আগে থেকে কিছু বলে লাভ নেই। প্রমাণগুলো সব হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে। মুখ বন্ধ করে দেবে ওর। যাতে কোন তর্ক আর করতে না পারে।

তা ছাড়া, এখন ফোনে ওর সঙ্গে জিনা কথা বলবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরও দেড়টি ঘণ্টা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে বেড়ানো বড় কঠিন। সৈকতে রওনা হলো মুসা। কুয়াশা এখনও আছে। ধূসর রঙের ভারী মেঘ জমেছে আকাশে। ঝুলে রয়েছে সাগরের ওপর। সূর্য ঢেকে অন্ধকার করে দিয়েছে। সৈকত থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে সানবেদারদের।

বালিয়াড়ির ধার ধরে কিছুক্ষণ হাঁটল সে। সময়টাকে দ্রুত পার করার জন্যে।

এগারোটা বিশে ফিরে এল ডেভেলপিং স্টোরে। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে স্বাগত জানাল ওকে ম্যানেজার, 'সরি!'

'কি হয়েছে?' বুঝতে পারল না মুসা। 'বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি? প্রিন্ট রেডি হয়নি?'

'না, হয়নি,' লাল চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে জোরে চুলকাতে লাগল ম্যানেজার।

'আরও সময় লাগবে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুসার কণ্ঠ। ঢিবঢিব বাড়ি মারতে আরম্ভ করেছে হৃৎপিণ্ডটা।

'আমার কিছু করার ছিল না,' হাত উল্টে হতাশ ভঙ্গি করল লোকটা। 'মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। গীয়ার। নিউটন'স কোভে আমাদের অন্য দোকানে ফোন করে দিয়েছি নতুন পার্টস দিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'কখন পাবেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গি করল ম্যানেজার। 'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দোকান খোলা আছে। আধা ঘণ্টা আগেই এসো। পেয়ে যাবে।' পাশে রাখা একটা স্থানীয় খবরের কাগজ তুলে নিয়ে হেডলাইন পড়তে শুরু করল সে। মুসা দাঁড়িয়েই আছে দেখে মুখ তুলে বলল, 'ঠিক সাতটায় চলে এসো। চিন্তা নেই। হয়ে যাবে।'

ষোলো

কোনমতে দিনটা পার করে দিল মুসা। সারাদিনে একবারের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। বিকেলে সামান্য পরিষ্কার হলো আকাশ। সাদাটে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম আকাশে। কিন্তু বাতাস সেই আগের মতই কনকনে।

দুপুরের পর কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করেছিল সে। তন্দ্রামত এসেছিল। সেই সামান্য সময়েও দুঃস্বপ্ন দেখল। লীলা এসে রক্ত খাওয়ার চেষ্টা করল তার।

চমকে জেগে উঠল সে।

ঘুমের মধ্যেও ধস্তাধস্তি করেছে। কিছুতেই রক্ত খেতে দেয়নি লীলাকে।

দিনের চেয়ে বিকেলের আলো খুব একটা কমল না। অতি সামান্য। কালচে ধূসর মন খারাপ করে দেয়া আলো। কোন কিছুই ভাল লাগে না।

মুসারও লাগল না। বিছানা থেকে নেমে ভাল করে চোখে মুখে পানি দিয়ে এল। পরিষ্কার একটা শার্ট পরল। কেন করল এ সব জানে না। বোধহয় মন ভাল করার জন্যে। মানিব্যাগে দেখে নিল টাকা আছে কিনা, ছবির বিল দিতে পারবে কিনা। টাকা না পেলে আবার ছবিগুলো আটকে দিতে পারে ম্যানেজার।

বেকার একটা দিন গেল। মেজাজই খারাপ হয়ে গেল ছবির দোকানের লোকটার ওপর। আরও খারাপ হবে ছবিগুলো যে ভাবে চাইছে সে, সেভাবে না এলে। ছবিতে জনের ছবি না উঠলেই কেবল জিনাকে বোঝাতে পারবে তার সঙ্গে আর মেলামেশা না করার জন্যে।

সাতটা বাজার কয়েক মিনিট আগে দোকানে ঢুকল মুসা।

হাসিমুখে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল ম্যানেজার। 'এই যে, এসে পড়েছ।'

কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না মুসা। 'হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা পেটমোটা খাম বের করে বড়সড় করে টেবিলে ফেলল ম্যানেজার। খামের মুখটা পাতলা টেপ দিয়ে আটকানো। 'সাংঘাতিক ক্যামেরা। স্পষ্ট ছবি। এত দামী জিনিস পেলে কোথায়?'

অহেতুক কথা বলার মেজাজ নেই মুসার। 'আমার বাবার। বিল কত হয়েছে?'

কয়েক সেকেন্ড পর খামটা প্যান্টের পেছনের পকেটে নিয়ে ঝড়ের গতিতে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আর্কেডে ছুটল জিনাকে ফোন করার জন্যে।

সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। ভারী মেঘ থাকায় আকাশ অস্বাভাবিক অন্ধকার। জন নিশ্চয় কফিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। ওর আগেই জিনার সঙ্গে দেখাটা করতে হবে তার। নইলে আজ রাতেও জিনাকে বের করে

http://www.murchona.com

নিয়ে যাবে জন। তারপর হয়তো দেখা যাবে জিনার লাশও রিকির মত সাগরের পানিতে ভাসছে।

পে ফোন থেকে জিনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা। বার বার চেষ্টা করেও লাইন পেল না। জবাব দিল না কেউ।

জিনাদের বাড়িতে লোক নেই। জিনা কোথায়? শহরে এসেছে? এলে কোন্ কোন্ জায়গায় যেতে পারে ভাবল। খুঁজতে চলল তাকে। প্রথমে এল শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মুভি থিয়েটারটায়। শো দেখার জন্যে লাইন দিয়ে থাকা মানুষগুলোর চেহারার দিকে তাকাতে লাগল। জিনা নেই এখানে। ডিউন লেন পার হয়ে প্রিন্সেসে এল এরপর। আইসক্রীম পারলার কিংবা আর্কেডের কোনখানেও নেই জিনা।

কোথায় গেল?

দোকানগুলোর ধার দিয়ে রাস্তার শেষ মাথার দিকে হেঁটে চলল মুসা। প্রতিটি রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকানে, কসমেটিক্সের দোকানে উঁকি দিল। জোড়ায় জোড়ায় হাঁটছে যে সব ছেলেমেয়ে, সবার কাছাকাছি এসে চেহারার দিকে তাকাল। কিন্তু নেই।

জিনা, কোথায় তুমি?

প্রায় একঘন্টা ধরে শহরের দোকানপাট, অলিগলি, সবখানে চষে বেড়াল মুসা। ঘড়ি দেখল। আটটা পনেরো।

পকেটে হাত দিয়ে খামটার অস্তিত্ব অনুভব করল একবার। আছে। সৈকতে রওনা হলো সে।

সী-ব্রিজ রোড ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল। গালে লাগছে সাগরের বাতাস। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু, শক্ত করে দিয়েছে শরীরের পেশিকে। থেকে থেকে পেটে খামচি ধরা একটা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘামের ধারা বইছে গাল বেয়ে। কয়েক মন ওজন লাগছে পা দুটোকে।

লাগুক। জিনাকে খুঁজে বের না করে থামবে না। কি রকম বিপদে রয়েছে সে, বোঝাতেই হবে। কিশোর হলে যা করত। ওকে বিপদ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত নিরাপদ হত না কিশোর। মুসাও হবে না।

মেঘে ঢাকা গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে সৈকতের বালির রঙ হয়ে উঠেছে নীলচে রূপালী। ঢেউয়ের উচ্চতা নেই বললেই চলে। আলতো করে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে সৈকতের কিনারা। ডুবন্ত সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না মেঘের আড়ালে থাকায়, তবে কালচে লাল করে তুলেছে পশ্চিমের মেঘপুঞ্জকে। সেই আলোর রেশ এসে লেগেছে সাগরের পানিতে। কিনারটা লালচে। গভীর যেখানে, সেখানকার রঙ সবুজ। তাতে কালো রঙ মেশানো। দূর থেকে সাগরের উল্টোদিকে বনের গাছগাছালির মাথাকেও একই রঙের লাগছে।

জিনা, দোহাই তোমার, দেখা দাও! কোথায় তুমি?

সৈকতে এখন অনেক লোক। সারাদিন যারা ঘরে বসে ছিল, তারাও বেরিয়েছে। সন্ধ্যাটা উপভোগ করার জন্যে।

বালিয়াড়ির ধার ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে মুসা। এগিয়ে চলেছে পানির দিকে।

হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল সূর্য। ডুবতে দেখা গেল না। মেঘের বুকে লাল রঙ মুছে যাওয়া দেখে অনুমান করা গেল ডুবেছে। মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল বাতাস। ঝপ করে নামল অন্ধকার।

দুইবার অন্য মেয়েকে জিনা বলে ভুল করল সে। দুটো মেয়েরই চুল জিনার মত। দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখে ভুল ভাঙল। ওর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েগুলো। মুচকি হাসল। বোকা ভেবেছে নিশ্চয়।

ভাবুকগে। মাথা ঘামাল না মুসা। জিনাকে খোঁজা চালিয়ে গেল।

দূর থেকে চোখে পড়ছে নৌকার ডকটা। সেদিকেই চলেছে সে, পাথরের পাহাড়ের একটা ধার যেখানে পানিকে ঠেলে সরিয়ে নেমে গেছে সাগরে, যার কাছে পাওয়া গিয়েছিল রিকির লাশ। দিনের আলো না থাকলেও সৈকতে এক ধরনের আলোর আভা থাকে প্রায় সব সময়। চোখে সয়ে এলে সেই আলোতে মোটামুটি অনেক কিছুই দেখা যায়। ডকের পানিতে তিনটে নৌকাকে ঢেউয়ে ডুবতে ভাসতে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

কয়েকজন মানুষ দেখা গেল তীরে। জিনা আছে বলে মনে হলো না। আর এগিয়ে লাভ নেই। ফেরা দরকার।

শহরেও নেই, সৈকতেও নেই। কোথায় গেল জিনা?

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে মুসা। নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়ার সময় জোরাল মচমচ শব্দ তুলছে তার জুতো। সেই শব্দের জন্যেই প্রথমবার ডাকটা কানে এল না তার। দ্বিতীয়বারেও না। তৃতীয়বারে শুনতে পেল, 'মুসা! আই, মুসা!'

'লীলা!'

থেমে গেল মুসা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। শিসের শব্দ বেরোচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। জিরানোর জন্যে বালিতে বসে পড়ে দম নিতে লাগল জোরে জোরে।

'মুসা, আমাকে খুঁজছ?'

দৌড়ে আসছে লীলা। বাতাসে উড়ছে চুল। চাঁদের আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে চোখের মণি। মড়ার মত ফ্যাকাসে গায়ের চামড়া।

কাছে এসে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল লীলা। আবার করল একই প্রশ্ন, 'মুসা, আমাকে খুঁজছ? এসে পড়েছি।'

এতই মোলায়েম কণ্ঠস্বর, মনে হলো বাতাসের সঙ্গে কানাকানি করে কথা বলছে লীলা, মধুর ঝঙ্কার তুলে। 'কাল দেখা করোনি কেন?'

হাঁটু গেড়ে মুসার পাশে বসে পড়ল সে। চোখে চোখ পড়ল। সম্মোহনী দৃষ্টি। মোলায়েম কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল লীলা, 'কাল দেখা করোনি কেন? কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে মন খারাপ লেগেছে।'

জবাব দিল না মুসা। মন খারাপ, না শরীর খারাপ? মনে মনে বলল সে। আমার রক্তে খিদে মেটাতে পারোনি বলে! পিশাচী কোথাকার!

আরও কাছে ঘেঁষে এল লীলা। চোখ দুটো স্থির মুসার গলার ওপর। কোনদিকে তাকিয়ে আছে সে বুঝতে অসুবিধে হলো না মুসার। ওর গলার শিরাটার দিকে। শিউরে উঠল।

আবার মুসার চোখের দিকে নজর ফেরাল লীলা। সম্মোহনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সতর্ক রয়েছে মুসা। আজ আর কোনমতেই ওর সম্মোহনের ফাঁদে ধরা দিল না। তাকে সাহায্য করল আরেকটা জিনিস। লীলার চোখ থেকে চোখ সরাতেই তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখা গেল ডকটা। একটা নৌকায় উঠেছে একজন লোক। হাত ধরে আরেকজনকে উঠতে সাহায্য করছে। ঢেউয়ে নৌকাটা দুলতে থাকায়ই বোধহয় যাকে তুলছে তার উঠতে অসুবিধে হচ্ছে।

জিনা!

ছোট্ট নৌকাটায় জিনাকে তুলে নিচ্ছে জন।

'না!' নিজের অজান্তেই মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার।

ওর দুই কাঁধ চেপে ধরল লীলা। মিষ্টি গন্ধ মুসার নাকে ঢুকতে আরম্ভ করল। দম আটকে ফেলল মুসা। সুগন্ধী মেশানো কোন ধরনের ওষুধ শুঁকিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয় এখানকার ভ্যাম্পায়াররা, কিংবা ঘুম পাড়িয়ে ফেলে নিরাপদে রক্ত খাওয়ার জন্যে, এটা এখন বুঝে গেছে সে।

নৌকার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। জিনা নৌকায় উঠে পড়েছে। দাঁড় তুলে নিয়েছে জন।

'না!' আবার চিৎকার করে উঠল মুসা।

লীলা ভাবল তাকেই বাধা দিচ্ছে মুসা। কাঁধে হাতের চাপ বাড়িয়ে মুসাকে আরও কাছে টানতে শুরু করল।

এত কাছে থেকে ওষুধের প্রভাব পুরোপুরি কাটাতে পারল না মুসা। বোঁ করে উঠল মাথার ভেতর। লীলার হাতের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে নিল নাকটা। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছে নৌকাটা তীর থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

'সত্যি বলছি, মুসা, কাল তোমার জন্যে ভীষণ মন খারাপ লেগেছে আমার,' কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল লীলা। কানের লতি ছুঁলো ঠোঁট।

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে মুসা। মুখটা সামিয়ে নিতে চাইছে গলার শিরায়।

একবার দাঁত ছোঁয়াতে পারলে আর রক্ষা নেই। কুটুস করে ফুটিয়ে দেবে। রক্ত শুষে নিতে শুরু করবে।

মিষ্টি গন্ধ অবশ করে আনতে শুরু করেছে মুসার অনুভূতি।

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। ছোট্ট দ্বীপটার দিকে চলেছে। যেটাতে লক্ষ বাদুড়ের বাস। যেটাতে ভ্যাম্পায়ারের বাস।

চলে যাচ্ছে জিনা নিয়ে যাচ্ছে ওকে জন। দূরে। বহুদূরে। চিরকালের জন্যে।

কিছু করতে না পারলে মুসা নিজেও হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে! এদিকেও ভ্যাম্পায়ার, ওদিকেও। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে আরম্ভ করল মুসা। বাঁচতে চাইলে এখনই কিছু করা দরকার। নইলে শেষ করে দেবে ওকে

লীলা।

ধাক্কা দিয়ে লীলাকে সরিয়ে দিল সে। ফাঁক হয়ে গেছে লীলার ঠোঁট। ধবধবে দুটো চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। ধকধক করে জ্বলছে দুই চোখ। তাতে রাজ্যের লালসা।

অবাক লীলাকে আরেক ধাক্কায় বালিতে ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

'মুসা, শোনো! দাঁড়াও! মুসা!'

কিন্তু ততক্ষণে ডকের দিকে দৌড় দিয়েছে মুসা। সরে যাচ্ছে লীলার সম্মোহনী দৃষ্টির মায়াজাল থেকে, মারাত্মক সুগন্ধীর কাছ থেকে দূরে। বালিতে, নুড়িতে পিছলে যেতে লাগল জুতো। মচমচ শব্দ। যতই দৌড়াল কেটে যেতে লাগল মাথার ঘোলাটে ভাবটা। দেখতে পাচ্ছে বোট হাউসের কাছে বাঁধা নৌকা দুটো দোল খাচ্ছে ঢেউয়ে।

পেছনের পকেট থেকে খামটা পড়ে গেল বালিতে। ফিরেও তাকাল না মুসা। তোলার চেষ্টা করল না। ওগুলো এখন অর্থহীন। একাকী জিনার দেখা পাবেও না আর, ছবি দেখিয়ে তাকে বোঝানোরও সময় নেই। ভ্যাম্পায়ারে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, ওদের ভয়ঙ্কর আস্তানায়। ঠেকানো দরকার।

ডকের কাছে আসার আগে গতি কমাল না মুসা। মুখের কাছে হাত জড় করে চেঁচিয়ে ডাকল 'জিনা! জিনা!' বলে।

তার ডাকে সাড়া দিল না জিনা। ফিরে তাকাল না।

সরে যাচ্ছে নৌকাটা। সাগরের পানিতে পড়া চাঁদের ঝিলমিলে ভুতুড়ে আলোতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার দ্বীপটার দিকে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে ক্রমে।

বনে ঢাকা দ্বীপ। বাদুড়ে বোঝাই দ্বীপ। ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ।

'ওহ্, খোদা!' ককিয়ে উঠল মুসা। 'বড্ড দেরি করে ফেললাম! অনেক দেরি!'

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল লীলার ওপর। ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী।

প্রচণ্ড রাগে ভয়ঙ্কর সব গালের হয়ে গেছে মুসার। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার ব্যবস্থা পরে করব আমি, শয়তানী! আগে ওই বদমাশটার একটা ব্যবস্থা করি!'

সতেরো

একটা নৌকার বাঁধন খুলতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না মুসার। দ্রুতহাতে গিট খুলে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল নৌকায়। দাঁড় তুলে নিল।

সময় বয়ে যাচ্ছে। মহামূল্যবান সেকেন্ডগুলোর টিক-টিক টিক-টিক

শব্দটাও যেন শুনতে পাচ্ছে সে।

লীলার ডাক কানে এল। তীরে দাঁড়িয়ে ডাকছে ওকে লীলা। ফিরে যেতে অনুরোধ করছে। ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, বালির ওপর দিয়ে বোট হাউসের দিকে দৌড়ে আসছে লীলা। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে যেন উড়ে আসছে। ওকে ধরতে আসছে নিশ্চয়।

ঝপাৎ করে পানিতে দাঁড় ফেলল মুসা। বাইতে শুরু করল। জনকে ধরতে হলে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া দরকার।

বোট হাউসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লীলা। বুঝতে পেরেছে, তার ডাকে সাড়া দেবে না মুসা। থামবে না। বাকি যে নৌকাটা আছে এখনও, সেটার দিকে ছুটল। শেষবার ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, নৌকার কাছে ঝুঁকে আছে লীলা। নিশ্চয় দড়ির গিট খুলছে।

যতটা ভেবেছিল মুসা, স্রোতের বেগ তার চেয়ে অনেক বেশি। যতই শক্তি দিয়ে সামনে এগোতে চাইছে সে, স্রোত তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এক ফুট সামনে এগোলে দুই ফুট পিছাচ্ছে। কি করে যেন বার বার পিছলে এসে স্রোতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নৌকাটা। কাত হয়ে যাচ্ছে, দুলছে ভীষণ। অথচ ঢেউ ততটা নেই।

কাত হলেই পানি ঢুকছে। দেখতে দেখতে মুসার জুতো ভিজে গেল নৌকার তলায় জমা পানিতে। জুতো ভিজল, মোজা ভিজল, জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল পানি। এ হারে উঠতে থাকলে নৌকা ডুবে যেতেও সময় লাগবে না। স্রোতের কারণে ঢেউগুলোও কেমন অশান্ত এখানে। নৌকার কিনারে বাড়ি লেগে পানির ছিটের ফোয়ারা সৃষ্টি হচ্ছে। চোখেমুখে এসে পড়ছে। চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য করছে ওকে।

নাহ, পারব না! হতাশা গ্রাস করতে চাইছে মুসাকে। অনেক দেরি করে ফেলেছি আমি।

কিন্তু হাল ছাড়ল না।

চোখ মেলে সামনের দিকে তাকাল। নৌকা কোথায়?

দ্বীপে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়।

চোখের পাতা সরু করে, নোনা পানির ছিটে বাঁচিয়ে দ্বীপের দিকে তাকাল সে। মেঘে ঢাকা চাঁদের ভুতুড়ে আলোয় কালো সাগরের পটভূমিতে ভয়ঙ্কর অজানা জলদানবের মত লাগছে দ্বীপটাকে।

বিশাল সাগর যেন গিলে নিয়েছে জিনাদের নৌকাটা। চিহ্নও দেখা গেল না ওটার।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। খুব নিচু দিয়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে উড়ে চলেছে শত শত বাদুড়। ফল খেতে যাচ্ছে। নাকি রক্ত! ওগুলোর মধ্যে কয়টা আছে ভ্যাম্পায়ার?

দ্বীপের আরও কাছে আসতে ওটার ওপরও ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়তে দেখা গেল। ডানার শব্দ আর কর্কশ, তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঢেউয়ের শব্দও চাপা পড়ে যাচ্ছে। খোলা পেয়ে বাতাস বইছে হু-হু করে। দামাল বাতাসে ভর করে উড়ছে

শত শত, হাজার হাজার বাদুড়। উড়ছে, চিৎকার করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, ডাইভ দিচ্ছে, ওপরে উঠছে, নিচে নামছে। দ্বীপের ওপরের আকাশটাকে ভরে দিয়েছে পঙ্গপালের মত। একসঙ্গে এত বাদুড় জীবনে দেখেনি মুসা। আমাজানের জঙ্গলেও না।

দ্বীপের কিনারে একটা ছোট বোট হাউস চোখে পড়ল ওর। পুরো দ্বীপটাকেই গিলে নিয়ে গাছপালা আর আগাছা এখন খুদে সৈকতটাকেও গ্রাস করতে চাইছে। ঢেউয়ে দুলতে দেখা গেল একটা বোট। নিশ্চয় ওটাই! জিনাকে নিয়ে আসা হয়েছে যেটাতে করে।

খালি নৌকা। দুজনের কাউকে দেখা গেল না ওতে।

ডকের কাছে এনে নৌকা থামাল মুসা। লাফ দিয়ে তীরে নেমে নৌকাটা টেনে তুলল বালিতে। চারপাশে তাকাল। সরু একটা পায়ে চলা পথ বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।

খালিহাতে না গিয়ে অস্ত্র হিসেবে দাঁড়টা হাতে রেখে দিল সে। ভ্যাম্পায়ারের মত মহাক্ষমতাধর শত্রুর বিরুদ্ধে অতি সাধারণ একটা দাঁড়। তুচ্ছ! মনে মনে ডেকে বলল, 'আল্লাহ্, তুমিই এখন আমার সবচেয়ে বড় ভরসা!'

মনে জোর এনে, সাহস সঞ্চয় করে, একটা দাঁড় সম্বল করে দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে পা বাড়াল সে। এগিয়ে গেল পায়ে চলা পথটার দিকে। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ।

মাথার ওপর নেমে এসেছে গাছের ডাল। এড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝেই মাথা নুইয়ে ফেলতে হচ্ছে। ডানা ঝাপটানোর শব্দের বিরাম নেই। কোন গাছ, কোন ডালই খালি নেই। সবগুলোতে বাদুড় আছে। ওকে দেখে চিৎকার করছে ওগুলো। দাঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে ভর্তা বানিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে রোধ করল সে। বাড়ি যদি মারতেই হয় ওগুলোর গুরুকে মারতে হবে, ভ্যাম্পায়ারকে। তাতে অবশ্য রক্তচোষা পিশাচের কিছু হবে কিনা সন্দেহ। ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা' পড়েছে। ছবিও দেখেছে। জেনেছে, ভ্যাম্পায়ার মারতে হলে হৃৎপিণ্ডে কাঠের কীলক ঢুকিয়ে দিতে হয়।

কথাটা মনে পড়তেই আরেকটা বুদ্ধি মাথায় এল চট করে। হাতের দাঁড়টাও কাঠের। মাথাটা যদি চোখা করে নেয়া যায়...কিন্তু ছুরি পাবে কোথায়? হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, দাঁড়ের মাথা মোটামুটি চোখাই আছে। প্রচণ্ড শক্তিতে খোঁচা মারলে হয়তো বসিয়ে দেয়া যাবে পিশাচের বুকে। কিন্তু সেটা দিনের বেলায় সম্ভব। কফিনে যখন শুয়ে থাকে ওরা, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে থাকে। এখন রাতে, পূর্ণ জাগরণের মধ্যে? অসম্ভব! মনকে হাত নেড়ে ভাবনাটা দূর করে দিল সে। এতসব যুক্তির কথা ভাবতে গেলে কোন কাজই হবে না। পিছিয়ে যেতে হবে। সব সময় এখন আল্লাহ-রসুলের কথাই কেবল মনে রাখা দরকার। তাহলে কোন প্রেতেরই ক্ষমতা হবে না তার ধারে কাছে ঘেঁষে।

পথের শেষ মাথায় নিচু চালাওয়ালা কাঠের তৈরি একটা বীচ হাউস।

অন্ধকার। কাছে এসে দেখা গেল কোন জানালায় একটা কাঁচও নেই। চালার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে বাদুড়ের ঝাঁক। একটা বাদুড় খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে মুসার গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে শাঁই করে পাশ কেটে সরে গেল, তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে।

দাঁড়টা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা গেল না।

ওর মনে হলো, জিনাকে নিয়ে এর মধ্যেই ঢুকেছে জন। এই বাড়িটাই ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। দ্বিধা করল একবার। তারপর যা আছে কপালে, ভেবে, দাঁড়ের মাথায় ভর রেখে লাফ দিয়ে উঠে বসল জানালার চৌকাঠে। পা রাখল ভেতরে।

সব ক'টা জানালা খোলা থাকার পরেও ভেতরে ভাপসা গন্ধ। হত্রাকের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আরও একটা বোটকা গন্ধ আছে। বুনো জানোয়ারেরা? নাকি শুকনো হাড়গোড়! ভাবতে চাইল না আর। দম আটকে রেখে লাভ নেই। কতক্ষণ রাখবে? তারচেয়ে এই বিশ্রী গন্ধযুক্ত বাতাসেই দম নিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া ভাল। তাতে চলাফেরা সহজ হবে।

অন্ধকার চোখে সওয়ানোর জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্থির। কানে আসছে বাইরের একটানা ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে ঘরটার অবয়ব। লম্বা, সরু একটা ঘর। বেডরুম। কিন্তু খাট বা বিছানা নেই।

কোন কিছুই স্পষ্ট নয়। আলো না হলে দেখা যাবে না।

হঠাৎ মনে পড়ল রিকির লাইটারটার কথা। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, আছে। বের করে আনল তাড়াতাড়ি।

কাঁপা আলোয় দেখতে পেল জিনাকে।

এক দিকের দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসানো বড় একটা আর্ম চেয়ারে নেতিয়ে আছে। গদি মোড়া একটা বিরাট হাতলে মাথাটা পড়ে আছে।

মরে গেছে ও! মুসার প্রথম ভাবনাই হলো এটা। মেরে ফেলা হয়েছে ওকে!

ভালমত দেখার জন্যে এগিয়ে গেল সে। জিনার হাতে হাত রাখল। গরম। ঠাণ্ডা হয়নি এখনও। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। না, মরেনি! নিঃশ্বাস পড়ছে!

জানালার কাছে দাপাদাপি শুরু করল কয়েকটা বাদুড়। আরও আসতে লাগল। প্রায় ঢেকে দিল জানালাটাকে। কয়েকটা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। আলোর পরোয়া করল না। যেন এই আলোর সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের। অবাক কাণ্ড, বদ্ধ ঘরে উড়তে গিয়ে মানুষের গায়ে কিংবা দেয়ালে ধাক্কা খেল না একটাও।

একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আলোর এত কাছাকাছি চলে এল, ডানার ঝাপটায় নিভে গেল লাইটার। খস করে টিপে আবার জ্বালল মুসা। মেঝেতে রাখা একটা হ্যারিকেন চোখে পড়ল। পুরানো, তবে মরচে পড়া নয়। বেশ

ঘষেমেজে রাখা হয়েছে। হ্যারিকেনটা তুলে আরও অবাক হলো। তেল ভরা। আশ্চর্য! ভ্যাম্পায়ারদের আলোর দরকার হয় নাকি? হ্যারিকেনও ব্যবহার করে! মনে পড়ল, কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গে প্রচুর লণ্ঠন ছিল। তবে সেগুলো ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ত না কাউন্টের। মেহমান এলে তাদেরকে জ্বেলে দিত।

হ্যারিকেন নিয়ে মাথা ঘামাল না আর। বাদুড়ের দিকেও নজর দেয়ার সময় এখন নেই। জিনা বেঁচে আছে। ওকে বের করে নিয়ে যাওয়া দরকার।

হ্যারিকেন ধরিয়ে লাইটারটা পকেটে রেখে দিল সে। দেখতে লাগল ঘরে কি কি আছে।

জানালা থেকে দূরে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা জিনিস চোখে পড়ল। চিনতে সময় লাগল না। খাইছে! কেঁপে উঠল মুসা। কফিন! ডালা নামানো। জন নিশ্চয় ওই কফিনে ঢুকে শুয়ে আছে!

আঙুলগুলো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল দাঁড়ের গায়ে।

বেশিক্ষণ ঘরে থাকল না বাদুড়গুলো। বেরিয়ে গেল। ঝটাপটির শব্দ বন্ধ হলো। তবে আবার আসবে ওরা, বুঝতে পারছে মুসা। যে কোন সময় ঝাঁক বেঁধে এসে ঢুকবে ঘরে। এখানে বাদুড়ের নিত্য আসা-যাওয়া, আচরণেই বোঝা যায়। আলফ্রেড হিচককের 'বার্ড' ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবির পাখিগুলোর মত খেপে গিয়ে বাদুড়রা যদি একযোগে এসে এখন আক্রমণ করে ওকে? ছিন্নভিন্ন করতে সময় লাগবে না! ওগুলোর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহন করছে এমন বাদুড়ও থাকতে পারে...

উদ্ভট ভাবনাগুলো জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জিনার দিকে ঘুরল সে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, 'জিনা! জিনা!'

গলা কাঁপছে ওর।

জিনার কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকি দিয়ে কণ্ঠস্বর আরেকটু চড়িয়ে আবার ডাকল, 'জিনা! ওঠো! এই জিনা!'

শিহরণ বয়ে গেল জিনার শরীরে। কিন্তু চোখ মেলল না।

'জিনা?' আরও জোরে কাঁধ ধরে নাড়া দিল মুসা।

আবার শিহরণ বইল জিনার শরীরে। কিন্তু মাথা তুলল না।

দুই হাতে ওর মাথাটা চেপে ধরে সোজা করল মুসা। চোখের পাপড়ি ধরে পাতা খোলার চেষ্টা করল।

'জিনা! ওঠো! উঠে পড়ো!' ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে মুসার। 'আই, জিনা, প্লীজ! বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!'

নড়ে উঠল জিনা।

ভরসা পেয়ে আরও জোরে ঝাঁকাতে লাগল মুসা।

অবশেষে চোখ মেলল জিনা। গুঙিয়ে উঠল, 'কে?'

'আমি, জিনা, আমি! মুসা! জলদি ওঠো! পালাতে হবে!'

পেছনে কারও উপস্থিতি টের পাওয়া গেল।

ঝট করে ঘুরে গেল মুসা।

জন!

ঠোঁট ফাঁক করে, শ্বদন্ত বের করে, জানোয়ারের নখের মত আঙুল বাঁকিয়ে মুসার গলা টিপে ধরতে ছুটে এল সে।

আঠারো

গলা চিরে বুনো চিৎকার বেরিয়ে এল মুসার। নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারল না। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো সে শব্দ। বাইরে বাদুড়ের কলরব বেড়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল জন। পরক্ষণে আবার আঙুল বাঁকা করে এগিয়ে এল মুসার দিকে। চকচক করছে ওর বড় বড় শ্বদন্ত।

জলজ্যান্ত ভ্যাম্পায়ারকে চোখের সামনে দেখে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে মুসা। ভাবনার সময় নেই। পরিকল্পনার সময় নেই। দাঁড়টা তুলে ধরল। চোখা দিকটা জনের দিকে করে।

এগিয়ে আসছে জন।

সামনে ছুটে গেল মুসা। কোনভাবেই যাতে মিস না হয়, একবারেই ঢুকিয়ে দিতে পারে জনের বুকে, সেভাবে দাঁড়টা ঠেলে দিল সামনের দিকে।

থ্যাপ করে জনের বুকে লাগল দাঁড়ের মাথা। পাঁজরের হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো। গলা চিরে বেরিয়ে এল বিকট চিৎকার।

দাঁড়টা ওর বুকে ঢোকেনি।

ঢোকানোর জন্যে টান দিয়ে পিছিয়ে এনে আবার ঠেলে দিতে যাবে মুসা, এই সময় দেখল তার আর প্রয়োজন নেই। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে জন। গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

এত সহজে ভ্যাম্পায়ারকে কাবু করতে পেরে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছে, মুখে এসে বসল একটা বড় মথ। থাবা দিয়ে ওটাকে সরাতেই কানে এল জিনার চিৎকার। 'মুসা, মুসা, বাঁচাও আমাকে! মেরে ফেলল!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। লীলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে জিনা।

এত তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে গেল!

বোট হাউসের তৃতীয় নৌকাটার কথা মনে পড়ল মুসার। দাঁড় হাতে লীলাকে গুঁতো মারার জন্যে এগোতে যাবে, এই সময় সাঁড়াশির মত পা চেপে ধরল শক্ত, শীতল কয়েকটা আঙুল। মরেনি জন। এত সহজে মরে না ভ্যাম্পায়ার।

লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার দাঁড়টা তুলে ধরল মুসা। উত্তেজনা, আতঙ্কে গুঁতো মারার কথা ভুলে গায়ের জোরে বাড়ি মারল জনের মাথা সই করে। ঢিল হয়ে এল আঙুলের চাপ। পা টা ছাড়িয়ে নিল মুসা।

আবার বাড়ি মারল জনকে সই করে। তাড়াহুড়োয় জায়গামত না লেগে অর্ধেক লাগল মেঝেতে। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল দাঁড়।

ভালই হলো। দাঁড়ের ডাণ্ডার মত অংশটা ওর হাতে রয়ে গেছে। ভাঙা দিকটা বর্শার ফলার মত চোখা। সেটা বাগিয়ে ধরে লীলার বুকে বসিয়ে দেয়ার জন্যে ছুটল সে।

মুসাকে আসতে দেখে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়ে সরে গেল লীলা। শেষ মুহূর্তে যেন ব্রেক কষে দাঁড়াল মুসা। সামলাতে না পারলে দাঁড়টা লাগত জিনার গায়ে। ওর পেটে ঢুকে যেত।

ঘুরে দাঁড়াল আবার মুসা। লীলাকে সই করে দাঁড় তুলে ছুটল।

আবার সরে গেল লীলা।

নেচে উঠল আলোটা। কেন, দেখার জন্যে ফিরে তাকানোর সময় নেই। মুসার নজর লীলার ওপর।

গুঁতোটা এড়াতে পারল না এবার আর লীলা। তবে ঠিকমত লাগল না। যেখানে লাগাতে চেয়েছিল মুসা, তার সামান্য ডানে লাগল, হৃৎপিণ্ডে নয়।

আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরে জনের পাশে পড়ে গেল লীলা। গোঙাতে লাগল। ওই সামান্য আঘাতে মরবে না। ঘাড়ের পাশে বাড়ি মারল মুসা। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল লীলার।

'জিনা! জলদি চলো···' বলে ওর দিকে ঘুরে দেখল হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। এগিয়ে যেতে শুরু করল মেঝেয় পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

'কি করছ?'

বিড়বিড় করে জবাব দিল জিনা, 'আগুনে নাকি ধ্বংস হয়ে যায় ভ্যাম্পায়ার!'

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কি করবে বুঝতে পারছে না। ভ্যাম্পায়ারের ধ্বংস সে-ও চায়। একটু আগে দাঁড় দিয়ে গুঁতো মেরে তা-ই করতে চেয়েছিল।

দুজনের গায়ে তেল ঢেলে দিল জিনা। মুসাকে জানালার দিকে যেতে বলে নিজেও পিছাতে শুরু করল। দাঁড়িয়ে গেল জানালার কাছে এসে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পড়ে থাকা দুই ভ্যাম্পায়ারের দিকে।

নড়তে শুরু করেছে লীলা। মরেনি। বেহুঁশ হয়ে ছিল।

দুজনকে সই করে জ্বলন্ত হ্যারিকেনটা ছুঁড়ে মারল জিনা।

কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে চাইল না মুসা। তাড়াতাড়ি জিনাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আগুনে সত্যি সত্যি ধ্বংস হবে কিনা ভ্যাম্পায়ার, নিশ্চিত নয় সে। হলে তো ভাল। নইলে ওরা আবার জেগে ওঠার আগেই পালাতে হবে দ্বীপ থেকে।

বুনোপথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে সৈকতে এসে পড়ল দুজনে। তিনটে ডিঙি এখন ঘাটে বাঁধা। যেটাতে করে এসেছিল মুসা, সেটাতে দাঁড় নেই। জন যেটায় করে জিনাকে নিয়ে এসেছিল, সেটাতে উঠল।

তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে সরে যেতে শুরু করল দ্বীপের কাছ থেকে।

সারাক্ষণ ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণের আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে বুক। দ্বীপের দিক থেকে কোন বাদুড় নৌকার বেশি কাছে এলেই চমকে উঠছে। ভাবছে বাদুড়ের রূপ ধরে চলে এসেছে জন কিংবা লীলা।

তবে এল না ওরা।

জিনা আবার নেতিয়ে পড়েছে। কোন কথা বলছে না। সাংঘাতিক ধকল গেছে ওর ওপর। নিশ্চয় ভয়াবহ রক্তশূন্যতায় ভুগছে। ফিরে গিয়েই আগে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মূল ভূখণ্ডের তীর দেখা যাচ্ছে। ফিরে তাকাল মুসা। দ্বীপের দিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়ল মনে হলো। নিশ্চয় বীচ হাউসটাতে আগুন লেগে গেছে।

লাগুক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক ভ্যাম্পায়ারের আস্তানা। অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছে জন আর লীলা। রিকিকে খুন করেছে।

রিকির কথা মনে হতেই অজান্তে হাত চলে গেল পকেটে। লাইটারটা ছুঁয়ে দেখল মুসা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোরে জোরে নৌকা বাইতে শুরু করল তীরের দিকে।

☆

পরদিন খুব সকালে আবার সৈকতে এসে হাজির হলো সে। দৌড়ে চলল বোট হাউসটার দিকে। ছবির খামটা পড়ে গিয়েছিল ওখানে। প্রচণ্ড এক কৌতূহল টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। ছবিগুলো দেখতে চায়। দেখবে জনের ছবি সত্যি উঠেছে কিনা।

আগের রাতে সে যাবার পর আর বোধহয় কেউ আসেনি এদিকে। খামটা বালিতে পড়ে আছে। শিশিরে ভেজা।

উবু হয়ে তুলে নিল। টান দিয়ে মুখ ছিঁড়ে বের করল একটা ছবি। প্রথমেই বেরোল সেই ছবিটা, ফেরিস হুইলের মেটাল কারে পাশাপাশি বসা জন আর জিনার ছবি। স্পষ্ট উঠেছে। বরং বলা যায় জিনার চেয়ে জনের ছবিটা আরও স্পষ্ট। হতবাক হয়ে গেল মুসা। তাড়াতাড়ি বাকি ছবিগুলো বের করে দেখতে লাগল। কোনটাতেই বাদ পড়েনি জন। সবগুলোতে আছে।

এর মানেটা কি? ভ্যাম্পায়ার বিশেষজ্ঞদের তত্ত্ব কি তবে ভুল? পিশাচেরও ছবি ওঠে?

মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে লাগল ওর। জিনাকে বাঁচানো গেছে বটে, হয়তো জন আর লীলাও ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এই ভ্যাম্পায়ার রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। সমূলে ওদের ধ্বংস করতে হবে। সেটা করা তার একার পক্ষে সহজ নয়। মগজ খাটানোর কাজগুলো তাকে দিয়ে হবে না। কিশোরের সাহায্য দরকার।

মনস্থির করে ফেলল, ফোনে যোগাযোগ করতে না পারলে কিশোরকে নিয়ে আসার জন্যে আগামী দিনই রকি বীচে রওনা হয়ে যাবে।

***